দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৯ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ১ মে ২০১৭।। ১৭ বৈশাখ - ১৪২৪।।
যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

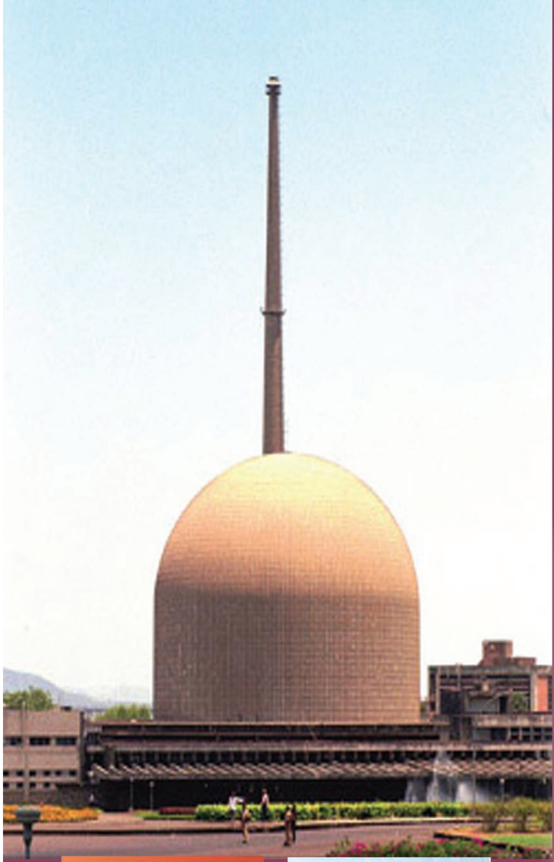

ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীদের রহস্যমৃত্যুর নেপথ্যে

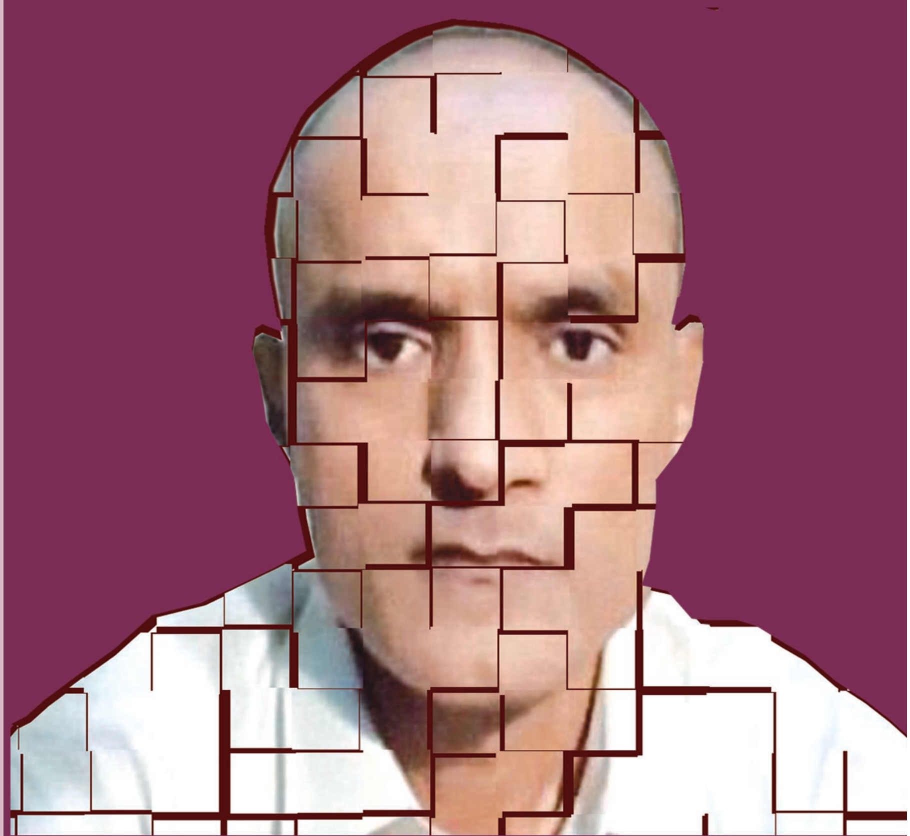

পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের শিকার

কুলভূষণ যাদব

- কুলভূষণ যাদব গতবছর ইরান থেকে অপহৃত হন। পাকিস্তানে তাঁর থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- কুলভূষণ যাদবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার কোনো প্রমাণ আদালতে পেশ করা হয়নি।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ১৭ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১ মে - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

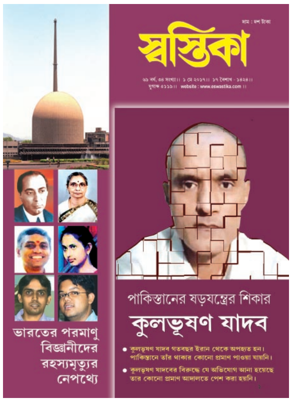

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

আইন শৃঙ্খলার এমন অবনতি নকশাল আমলের পর বাংলার মানুষ দেখেনি □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : দিল্লি এবার দিদির, অঙ্কটা দেখে নিন □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

গেরুয়া ঝড় উঠেছে বাংলায়, উড়ে যাচ্ছে যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় □ প্রবাল চক্রবর্তী □ ১২

চীনের বিরোধিতাই ভারতের এন এস জি সদস্য লাভে বাধা □ দেবীপ্রসাদ রায় □ ১৫

ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীদের রহস্যমৃত্যুর নেপথ্যে □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ২১

পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের শিকার কুলভূষণ যাদব □ দীপ চক্রবর্তী □ ২২

হায়! ইভিএম-কে ফাঁসিয়ে দেওয়ার মজাদার খেলাটা আর উপভোগ করা যাবে না □ জয় পণ্ডা □ ২৭

আদি সাংবাদিক দেবর্ষি নারদ এবং সংবাদমাধ্যম □ সাধন কুমার পাল □ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত □ সলিল গেঁউলি □ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** □

অঙ্গনা : ৩৪ □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **অন্যরকম : ৩৬** □

নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১**□

প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দলাই লামা এবং ভারত-চীন সম্পর্ক

সম্প্রতি তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামার অরুণাচল প্রদেশ সফর কেন্দ্র করে চীন বেশ কয়েকবার ভারতকে হুমকি দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, ভারত যদি সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ধর্মগুরুর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ না করে তাহলে দু-দেশের সম্পর্কের ক্ষতি হবে। কিন্তু সেই ক্ষতি ঠিক কী ধরনের তা এখনও অজানা।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে চীনের হুমকির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে দুটি মনোজ্ঞ রচনা। লিখবেন— দিব্যজ্যোতি রায়চৌধুরী ও প্রণয় রায়।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরে নূতন জেহাদ

কাশ্মীর উপত্যকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আবার অবনতি হইতেছে। পক্ষকাল আগে শ্রীনগর লোকসভার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে উপত্যকা। উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর উদ্দেশে পাথর নিক্ষেপ চলিতেছেই। এইবার পাথর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে ছাত্রীরাও রহিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা যখন দিল্লিতে তখন পুলওয়ামায় পিডিপি নেতা আবদুল গনিদারকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে জঙ্গিরা। পাথর বর্ষণের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার মতো প্রযুক্তিও কাজে লাগাইতেছে বিক্ষোভকারীরা। এই পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করিতে যতটা সম্ভব অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাশ্মীর নীতি অনুসরণ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অনুরোধ করিয়াছেন মেহবুবা। অর্থাৎ 'ইনসানিয়ৎ, জমুরিয়ৎ, কাশ্মীরিয়ৎ'—একমাত্র আলোচনাই কাশ্মীরে শান্তি রক্ষা করিতে পারে। অন্যদিকে সরকারের স্পষ্ট কথা হইল—সংবিধানের আওতার মধ্যে থাকিয়াই—কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মানিয়া লইয়াই কথা বলিতে হইবে। কিন্তু হুরিয়তের নেতারা শর্তহীন আলোচনা চায়।

কাশ্মীর সমস্যা নূতন কোনো সমস্যা নয়। প্রায় সত্তর বৎসরের পুরাতন। গত সাত দশক ধরিয়া মাঝেমধ্যেই কাশ্মীর উপত্যকা অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। কাশ্মীর উপত্যকার সাম্প্রতিক অশান্ত পরিস্থিতির কারণ সেই একই—মৌলবাদী ইসলাম। পক্ষকাল আগে প্যারিসে সন্ত্রাসী আক্রমণের পশ্চাতে, বস্তুত সকল জেহাদি সন্ত্রাসবাদী হামলার মূলে সেই একই ইসলামের জাতিগত সত্তাটি ক্রিয়াশীল। এই সত্যটিকে যতক্ষণ না স্বীকার করা হইবে, ততক্ষণ আলোচনা করিয়া কোনো লাভ হইবে না। নরমপন্থী মুসলমানগণ যতক্ষণ নিজেদের সম্প্রদায়গত অবস্থা ও বিশ্বাসের কারণে এই জেহাদি কাজকর্মকে সমর্থন করিয়া চলিবে ততক্ষণ উপত্যকায় এই অশান্তির আগুন বারবার জ্বলিয়া উঠিবে। এই বিষয়ে কাহারও যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহা হইলে বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর হিজবুল মুজাহিদিনের নবনিযুক্ত কমান্ডার জাকির রসিদ ভাট-এর বক্তব্যটি স্মরণ করা যাইতে পারে। রসিদ বলিয়াছে—'আমরা যখন পাথর বা বন্দুক হাতে তুলিয়া লই, তখন শুধু কাশ্মীরকে স্বাধীন করিবার জন্যই নহে, আসল লক্ষ্য হইল শরিয়ত মোতাবেক ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা।' এই বক্তব্যেই স্পষ্ট যে ইসলামে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। তাই উপত্যকার শ্রীনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচনে পোলিং বুথ জ্বালাইয়া দেওয়া এবং ইভিএম মেশিন নষ্ট করিয়া দেওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নাই। কাশ্মীরের রাজনীতিকরা যে পাথর বর্ষণকারীদের 'জাতীয়তাবাদী' ও 'বিপথে চালিত যুবক' বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, ইহাতেও তাই আশ্চর্যের কিছু নাই। বস্তুত মৌলবাদী ইসলামের পরিকল্পনা অনুযায়ীই এইসব ঘটিতেছে। নরমপন্থী ইসলাম যদি ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের কারণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা কাশ্মীরের জন্য কতদূর যাইতে পারে তাহা একবার কল্পনা করা যাইতে পারে।

একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে কাশ্মীর সমস্যার একটি নূতন অধ্যায় শুরু হইয়াছে যাহার সহিত ঐতিহাসিক পরম্পরার কোনো সম্পর্ক নাই। কাশ্মীর উপত্যকায় যাহা চলিতেছে তাহা বিশ্বব্যাপী জিহাদের অঙ্গমাত্র। পুরাতন নীতি লইয়া এই সমস্যার তাই সমাধান করা যাইবে না। এই সমস্যার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারেন। সরকারকে যত শীঘ্র সম্ভব একটি স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে হইবে যে উপত্যকায় আরও একশত বৎসর ধরিয়া হিংসাত্মক উত্তেজনা চলিতে থাকিলেও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই থাকিবে। যে কাশ্মীরীদের কাছে ইসলাম জাতির থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাহাদের স্বাগত জানাইবার জন্য ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

পরোপদেশ পাণ্ডিত্যে শিষ্টাঃ সর্বে ভবন্তি বৈ।
বিস্মরন্তি হ শিষ্টত্বং স্বকার্যে সমুপস্থিতে।।

অপরকে উপদেশ দেবার সময় সবাই জ্ঞানী হয়ে যান। কিন্তু নিজে কাজ করার সময় সমস্তরকম শিষ্টাচার ভুলে যান।

হিজাব পরা নিয়ে বিতর্ক : মালদহের স্কুলে মৌলবাদী হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে 'সাচ্চা হিন্দু' বলে জাহির করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজের ওপর মুসলমানদের একাংশের আক্রমণ-উৎপীড়ন সম্বন্ধে এখনও তিনি আগের মতো নিষ্ক্রিয়। সেই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে মুসলমান মৌলবাদীরা এবার মালদহের একটি স্কুলে হামলা করল। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, কালিয়াচকের থানা পোড়ানোর ঘটনা থেকে প্রশাসন কোনো শিক্ষা নেয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গত কয়েক বছর ধরে ঘটতে থাকা সাম্প্রদায়িক হামলাগুলিরও কোনো কিনারা হয়নি। প্রশাসনের প্রশ্রয়েই মুসলমানদের দুঃসাহস দিন-দিন বাড়ছে।

খবরে প্রকাশ, কালিয়াচক থানা এলাকার বিরামপুর গ্রামের রথবাড়ি হাইস্কুলে ফার্স্ট টারমিনাল পরীক্ষা চলছিল। গত ১৮ এপ্রিল হঠাৎই বেশ কিছু ছাত্রী হিজাব পরে স্কুলে আসে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা তাদের বারণ করেন। তাদের স্কুলের ইউনিফর্ম পরে আসতে বলা হয়। তাতে ফল হয় উল্টো। পরের দিন আরও

বেশি সংখ্যায় ছাত্রী হিজাব পরে আসে। কিছুক্ষণ পর প্রায় শ' দেড়েক উন্মত্ত অভিভাবক স্কুলে চড়াও হয়ে প্রধান শিক্ষককে মারধর করে। পরে পুলিশ এসে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে।

অভিভাবকদের দাবি, হিজাব তাদের ধর্মীয় পোশাকের অঙ্গ। সুতরাং হিজাব পরে আসার অনুমতি দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই স্কুলের হাজারখানেক পড়ুয়ার মধ্যে ৬০০ জন হিন্দু। ২০০৮ সালে এই স্কুলেরই বিভিন্ন ক্লাসরুমের দরজায় মুসলমানরা গোরুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ইংরেজবাজারের মিল্কি হাইস্কুলের দিকে যেভাবে মসজিদের মাইক ঘুরিয়ে তারস্বরে আজান দেওয়া হয় তাতে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধে হলেও ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় মাইক বন্ধ রাখার অনুরোধ করলেও মৌলবিরা শোনেননি।

ক্ষোভ রয়েছে সর্বস্তরেই। এই ক্ষোভ যে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে তার প্রমাণ মিলেছে রামনবমীর শোভাযাত্রায়। কিন্তু আরও বড়ো প্রমাণ চাই। সম্ভবত সেই বড়ো প্রমাণের অপেক্ষাতেই আপাতত দিন গুণছে পশ্চিমবঙ্গ।

প্রাক্তন সিআইএ প্রধানের দাবি

পাক আশ্রয়ে আল জোয়াহিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারা বিশ্বে 'মোস্টওয়ান্টেড' জঙ্গি, মিশরীয় বংশোদ্ভূত আল কায়দা নেতা আল জোয়াহিরি এখন সম্ভবত করাচিতে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর গোপন ডেরায় লুকিয়ে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এই অভিমত পোষণ করেছে।

'২০০১ সালে আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে আলকায়দা জঙ্গিদের তাড়িয়ে দেবার পর তাদের নেতা আল জোয়াহিরি এখন পাকিস্তানের ইন্টার-সারভিস ইন্টেলিজেন্স সারভিস এজেন্সির (আই এস আই) আশ্রয়ে রয়েছে।' ---বিখ্যাত সংবাদপত্রিকা নিউজউইকে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এই মন্তব্য করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে এই মন্তব্য বলে তাদের দাবি। নিবন্ধ লেখক লিখেছেন,

আল জোয়াহিরি

'জোয়াহিরির সম্ভাব্য ঠিকানা এখন করাচি।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রথম কোনো সংবাদমাধ্যম জোয়াহিরির ঠিকানা সম্বন্ধে এত জোরের সঙ্গে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করল। এদিকে, মার্কিন গুপ্তচর এজেন্সি সিআইএ-র প্রাক্তন প্রধান যিনি চারজন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কিত উপদেষ্টা ছিলেন, সেই ব্রুস রিডেলও পত্রিকার দাবি মেনে নিয়ে বলেন, 'অ্যাবোটাবাদে অপারেশনের (যে অভিযানে লাদেন নিহত হয়) সময়েই কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। সম্প্রতি আরও কিছু মিলেছে যা নিশ্চিত করে করাচিই লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা।' তিনি জানান, অ্যাবোটাবাদের মতো অভিযান করাচিতে করা কঠিন। কারণ করাচিতে প্রায় এক কোটি সতেরো লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। তবে জোয়াহিরি যদি পাক-আফগান সীমান্তে কোথাও থাকেন তাহলে জোয়াহিরির পিছু ধাওয়া করা আমেরিকার সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে আমেরিকার ড্রোন হানায় আলজোয়াহিরি অল্পের জন্য বেঁচে যান। চশমা ভেঙে গেলেও তার কোনো ক্ষতি হয়নি। যে ঘর লক্ষ্য করে ড্রোন থেকে বোমা ছোড়া হয়েছিল, মাত্র দশ মিনিট আগে জোয়াহিরি সেই ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে যাওয়ায় সে যাত্রায় মার্কিন অভিযান ব্যর্থ হয় বলে সিআইএ প্রধান জানান।

একই সঙ্গে পৃথক দু'টি অপরাধ

বিজয় মাল্যর প্রত্যার্পণের বিষয়ে সিবিআই আশাবাদী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ইংল্যান্ড ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (সিপিএস) আগামী মাসে যখন সে দেশের ওয়েস্ট মিনিস্টার আদালতে ভারতের অর্থনৈতিক অপরাধী মূলত মদ ব্যবসায়ী বিজয় মাল্যর ভারতে প্রত্যাপর্ণের মামলার বিচার শুরু করবে তখন একদিকে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঠকানোর সঙ্গে সঙ্গে বেআইনি পথে অর্থ লোপাটের অভিযোগের মতো দ্বৈত অপরাধকেই ব্রিটিশ আইন মোতাবেক বিবেচনায় আনা হবে। প্রত্যার্পণ মামলার শুনানির সময় সিপিএস আদালতে ভারতের পক্ষে দাঁড়ানো আইনজীবীদের বিলিতি বিচারকদের কেবল একটি বিষয় নিঃসংশয় করাতে হবে যে দেশে ফেরত আনার পর অভিযুক্ত মাল্যর ক্ষেত্রে কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটবে না। তাঁর বিচার প্রক্রিয়া স্বাভাবিক পথেই এগোবে।

ভারতের সিবিআই-এর সূত্র অনুযায়ী ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপ করা ইংল্যান্ডের আইনি মাপকাঠিতেও একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেচ্ছভাবে টাকা পাচার বা টাকার হেরাফেরি করা দীর্ঘদিন ধরেই গর্হিত অপরাধের মধ্যে পড়ে। সিবিআই ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড সরকারের সঙ্গে এই সংক্রান্ত পর্যাপ্ত কাগজপত্র আদান প্রদান করেছে কিন্তু প্রমাণ হিসেবে এই মুহূর্তে আর কোনো বাড়তি তথ্য সেখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যার্পণ সংক্রান্ত আবেদনের ক্ষেত্রে বিচারপতি দেখবেন মাল্য একই সঙ্গে দু' দুটি অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে ছিলেন কিনা এবং সেই অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ রয়েছে কিনা?

সূত্র অনুযায়ী আদালত যদি প্রত্যার্পণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা নেয় তখনই বিষয়টি বিলেতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব আম্বের রুডের বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর যদি ভারত সরকারের অনুকূলে রায় দেন সেক্ষেত্রে মাল্য নিশ্চিত তা উচ্চ-আদালতে চ্যালেঞ্জ করবেন। তখনই সিপিএস (ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস) ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছ থেকে আরও বাড়তি প্রমাণ চাইতে পারে।

আদালত সূত্র অনুযায়ী এই মুহূর্তে প্রত্যার্পণ মামলাটি শুধুমাত্র উভয়পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল জবাবের ওপরই নির্ভর করে আছে কেননা অভিযুক্ত মাল্য যে জালিয়াতির মাধ্যমেই IDBI ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর অধুনা লুপ্ত king fisher Airlines এর জন্য ৯০০ কোটি টাকা আদায় করেছিলেন ও অসৎ উপায়ে সেই টাকা তাঁর অন্যান্য ব্যবসায়ে পাচার করেছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ ইংল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও সিপিএস-এর কাছে মজুত আছে। এই প্রমাণগুলির অভ্রান্ততা ও নিশ্ছিদ্রতার ফলে নিশ্চিতভাবেই মাল্যকে দেশে ফেরানো সম্ভব হবে এমনটাই অভিমত সিবিআই কর্তাদের।

এই মর্মে ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে কোনো পেশাগত (আইন মন্ত্রকের বাইরে থাকা) স্বাধীন আইনজীবী নিয়োগ করা হবে কিনা এ সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র বিদেশ দপ্তরই নিতে পারবে এমনটাই তাঁদের মত।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আদালতে ভারতের হয়ে কোনো আইনজীবীই কোনো সওয়াল করবেন না। বিলেতের সিপিএস-কে ভারতের তদন্ত সংস্থা সিবিআই ও ভারতীয় ব্রিটিশ দূতাবাসের তরফে সব রকমের প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা দেওয়া হবে বলে প্রকাশ। আদালতে শুনানি চলবে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে অভিযুক্ত মাল্যর।

এই সূত্রে ইডি ও সিবিআই উভয়েই মাল্যর প্রত্যার্পণ সম্পর্কে প্রচণ্ড আশাবাদী কেননা তাঁদের মত অনুযায়ী বিলেতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর মাল্যর বিরুদ্ধে দাখিল হওয়া অর্থনৈতিক অপরাধের প্রমাণগুলির যথার্থতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়াতেই তারা মাল্যকে আদালতে তুলেছে।

প্রসঙ্গত মাল্য ভারতের নানান ব্যাঙ্ক থেকে Consortiusm Advance হিসেবে ৬০২৭ কোটি অঙ্কের বিশাল টাকা (SBI যার মূল Banker ছিল) প্রতারণা করে হস্তগত করেছিলেন। তাঁকে ব্যাঙ্কগুলি তাদের পরিভাষায় 'ঋণ খেলাপি' Defaulter ঘোষণা করার পর Red Corner notice জারির আগেই তিনি লন্ডনে ফেরার হয়ে যান। এদেশে তাঁর প্রায় ৯০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এমন একটি বিশাল দুঃসাহসিক অর্থনৈতিক অপরাধের কিনারা দেখতে সকলেই উদগ্রীব।

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন, উন্নতি করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

জানুয়ারি-ডিসেম্বর অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন, জুলাই থেকেই জিএসটি চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর অর্থবর্ষ চালু করার ব্যাপারে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের বৈঠকের পর গভর্নিং কাউন্সিল একটি সরকারি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ভারত এমন একটি দেশ যেখানে কৃষিজ আয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কৃষক তাঁর ফসল বিক্রি বাবদ আয় ঘরে তোলা মাত্র কেন্দ্রীয় বাজেট তৈরি করে ফেলা উচিত। তিনি বলেন, অর্থবর্ষ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত করার জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব সরকারের কাছে এসেছে। তিনি প্রতিটি রাজ্যকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবারের বাজেট প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারির শেষদিনে পেশ না করে প্রথম দিনে করেছে কেন্দ্র। তখনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অর্থবর্ষ পরিবর্তনের সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। অর্থবর্ষ পরিবর্তনের অর্থ হলো, বাজেট পেশ, করপ্রদান এবং রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়েরও পরিবর্তন। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ এবং রাজ্যগুলির সক্রিয় সহযোগিতা-নির্ভর। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি রাজ্যকে এই বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেছেন।

আর একটি বিবৃতিতে নীতি আয়োগ জানিয়েছে, ১ জুলাই থেকে সারাদেশে জিএসটি (পণ্য পরিষেবা কর) চালু করতে চায় সরকার। এই ঘোষণা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিল্পমহলের একাংশ জিএসটির প্রচলন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী জিএসটি-র মাধ্যমে 'এক জাতি, এক উপলব্ধি, এক সঙ্কল্পে'র বার্তা দিতে চাইছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

রাজ্যগুলির কাছে প্রধানমন্ত্রী কী চান :

- আরও আগে বাজেট পেশ করুক রাজ্যগুলি এবং অর্থবর্ষ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হোক।
- দুর্নীতি রোধে ই-মার্কেট প্লেস প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার আরও বাড়ানো দরকার।
- ১ জুলাই থেকে জিএসটি চালু করার জন্য বিধানসভা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।
- সময়মতো লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য ২০২২-কে লক্ষ্যবর্ষ ধরে এখন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ুক প্রতিটি রাজ্য।
- খরচ বাঁচাতে ভীম এবং আধার কার্ডের ব্যবহার আরও বাড়াতে হবে।
- মূলধনী ব্যয়ে আরও গতি আনতে হবে; পরিকাঠামোগত উন্নয়নেও রাজ্যগুলিকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাওবাদী রুখতে বস্তারে স্থায়ী সেনা ছাউনি গড়ার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ছত্তিশগড়ের সুকনায় রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। ৯৯ জন জওয়ান সেখানে গিয়েছিলেন শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য। সেই সুযোগে মাওবাদীরা আক্রমণ করে। প্রায় ৩০০-৪০০ জঙ্গির এলাপাথাড়ি গুলিতে নিহত হন ২৫ জন জওয়ান। গত সাত বছরে নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর মাওবাদী আক্রমণের নৃশংসতা বিচারে প্রথম তিনে থাকবে এই হামলা। এক সরকারি বিবৃতিতে সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুরকাপোল ছাউনি থেকে বাহিনীর ৭৪নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা সুকনায় গিয়েছিলেন শ্রমিকদের নিরাপত্তার কারণে। জঙ্গল পরিবেষ্টিত সুকনা মাও জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসেবে সুপরিচিত। বেলা সাড়ে বারেটার সময় ৩০০-৪০০ জন জঙ্গি তিন-চারটি দলে বিভক্ত হয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করলে। মারা যান ২৫ জন জওয়ান। গোড়ায় হতচকিত হয়ে গেলেও পরে জওয়ানরাও যুৎসই জবাব দেন। অনেক জঙ্গি মারা যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে. বিজয়কুমার বলেন, 'গত দু'বছরে সুকনায় অনেকগুলো রাস্তা তৈরি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতেই এখন মাওবাদীদের ভয়। সেই ভয় থেকেই এই হামলা।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ে রাস্তাঘাট নির্মাণে সিআরপিএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে এখানে স্কুল, হাসপাতাল সবই হবে। সরকারি পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধে হবে না। তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে মাওবাদী নেতারা। এদিকে, নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর মাওবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব এল.সি গোয়েল বস্তারে একটি স্থায়ী সেনাশিবির গড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'স্বরাষ্টসচিব থাকার সময় আমি বস্তারের অবুঝমরে স্থায়ী সেনাশিবির গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তখন হয়নি কিন্তু এখন করা যায়।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেন, সরকার এই হামলাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নেবে।

মহারাষ্ট্রে পুরভোটে বিজেপির জয়যাত্রা অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মহারাষ্ট্রে পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়যাত্রা অব্যাহত। লাতুর পুরসভার ৭০টি আসনের মধ্যে ৩৬টি পেয়েছে বিজেপি যেখানে গতবারে একটি আসনও তাদের দখলে ছিল না। লাতুর বরাবর কংগ্রেসের গড় বলেই পরিচিত। প্রয়াত কংগ্রেস নেতা

পুরসভা	আসন	বিজেপি	এনসিপি	কংগ্রেস	শিবসেনা
লাতুর	৭০	৩৬	১	৩৩	০
চন্দ্রপুর	৬৬	৩৬	২	১২	২
পার্বণী	৬৫	৮	১৮	৩১	৬

বিলাসরাও দেশমুখের শহর হিসেবেই লোকে জানে। চন্দ্রপুর পুরসভাও বিজেপির দখলে এসেছে। সেখানে মোট ৬৬টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৩৬টি। কংগ্রেস ও এন সি পি যথাক্রমে পেয়েছে ১২ ও ২টি আসন। পার্বণী পুরসভা অবশ্য ৩১টি আসন পেয়ে কংগ্রেস দখল করেছে। পার্বণীর ৬৫টি আসনের মধ্যে এনসিপি পেয়েছে ১৮ ও বিজেপি ৮টি। শিবসেনা লাতুরে কোনো আসনই পায়নি। চন্দ্রপুরে ২ ও পার্বণীতে ৬টি আসন পেয়ে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

পাকিস্তানে জইশ-ই-মহম্মদের অর্থসংগ্রহ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কয়েকমাস আগে পাকিস্তান সরকার জইশ-ই-মহম্মদের নেতা মাসুদ আজহারকে গৃহবন্দি করেছিল। সেই সময় অনেকেই পাকিস্তানের এই পদক্ষেপকে 'লোক দেখানো' বলে সমালোচনা করেছিলেন। কথাটা যে মিথ্যে নয় তার জলজ্যান্ত প্রমাণ সম্প্রতি মিলেছে জইশ-ই-মহম্মদের মুখপত্র আল-কালাসে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা গেছে, জঙ্গি কার্যকলাপ আরও বাড়াতে জইশ-ই-মহম্মদ পাকিস্তানের মাটিতেই অর্থসংগ্রহ অভিযানে নেমেছে। এবং প্রশাসন এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। জইশের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের প্রত্যেক কৃষক এবং কৃষিজমির মালিকদের অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন ফসল বিক্রির একটা অংশ ধর্মীয় কর হিসেবে জইশের তহবিলে দান করেন। উদ্দেশ্য, 'ধর্মযুদ্ধে শহিদ, শত্রুর হাতে বন্দি এবং যুদ্ধরত সৈন্যদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তহবিল বৃদ্ধির উদ্যোগে শামিল করা হয়েছে মসজিদগুলিকেও। জইশের অর্থসংগ্রহ অভিযানের খবরে ভারতের সন্ত্রাস দমন বিভাগের আধিকারিকেরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মাজার-ই-শরিফের ভারতীয় দূতাবাস থেকেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

উবাচ

"আমার সদিচ্ছার (রাজনৈতিক সংস্কারে) কোনো অভাব নেই, বরং একটু বেশিই আছে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

সিভিল সার্ভিস ডে-তে আমলাদের সভায়।

"আমরা ১৫টি রাজ্যে শাসন করছি। শিল্পে ও পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মরত কোনো মুসলমান ভদ্রজন নির্যাতিত হয়েছেন?"

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী

হিরো গ্রুপ-এর আয়োজিত সভায় এক প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে।

"সবকা সাথ সবকা বিকাশ' নীতিকে অনুসরণ করে স্বচ্ছ, সুস্থ ও সমৃদ্ধির দিক থেকে উত্তরপ্রদেশকে একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়তে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

যোগী আদিত্যনাথ
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

নীতি আয়োগ গভর্নিং কাউন্সিল-এর বৈঠক প্রসঙ্গে।

"রাজনৈতিক শাসকের ইচ্ছা ও পছন্দের কারণে আইনের শাসন কারোর পক্ষে ক্ষতিকর হওয়া উচিত নয়।"

মদন বি লুকার ও দীপক গুপ্তর বেঞ্চ
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

একজন আইপিএস অফিসারকে কেরল সরকারের সরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে।

"কলকাতায় একজন বাঙালি কেন যে আর একজন বাঙালির সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেন কিছুতেই বুঝতে পারি না। বিরক্তিকর!"

জয়া আহসান
বাংলাদেশি অভিনেত্রী

কলকাতা ও বাংলাদেশে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে।

আইন শৃঙ্খলার এমন অবনতি নকশাল আমলের পরে বাংলার মানুষ দেখেনি

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এখন কোনো কিছুই অসম্ভব ঘটনা নয়। যেমন গত রাজ্য বিধানসভার ভোটের আগে কংগ্রেস- সিপিএম জোট। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল-সিপিএম জোট গড়ার ডাক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যে সিপিএমকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে দিদিভাই কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেস দল গড়েছিলেন। আজ সেই তিনি বলছেন, 'পাড়ায় পাড়ায় সিপিএমের লোকদের বুঝিয়ে-বাজিয়ে বলুন, বিজেপিতে যাবেন না।' দলের নেতাদের কাজকর্মে হতাশ বামকর্মী সমর্থকরা বিজেপি নয়, তৃণমূলকে ভোট দিন। দিদিভাই বলেছেন, সিপিএম এখন তাদের ভোট বিজেপিতে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে। কাঁথি দক্ষিণের উপনির্বাচনের ফল দেখে মমতা বলেছিলেন, বামের ভোট রামে পড়েছে। এটা বন্ধ করতে সিপিএমকে বুকে টেনে নিতে হবে তৃণমূল কর্মীদের। নেত্রীর ফরমুলায় সিপিএম-তৃণমূল জোট হলে বাংলায় বিজেপির নবোত্থান ঠেকানো যাবে। সহজ কথায়, সিপিএমকে তিনি আর রাজনৈতিক শত্রু বলে মনে করেন না। বিজেপিই এখন তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

ভারতের রাজনীতিতে কেউ কারো শত্রু নয়, কেউ কারো মিত্র নয়। সমস্যাটা হয় নীচুতলার সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় নেতারা যখন মার্কসবাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে কংগ্রেসের হাত ধরেছিলেন তখন পার্টির কর্মী-সমর্থকরা এই আদর্শহীন জোট মেনে নেননি। সিপিএম নেতাদের জামাকাপড় খুলে গামছা পরিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছিলেন। সূর্য মিশ্রের মতো নির্বোধ নেতারা আজ পর্যন্ত দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছে ভুল লাইন নেওয়ার জন্য ক্ষমা চাননি। কেরলে সিপিএম তার সমর্থকদের শক্তির উপর নির্ভর করেছিল বলেই ক্ষমতায় ফিরেছে। সন্দেহ নেই যে বঙ্গে কমিউনিস্ট নেতাদের ক্ষমতায় ফেরার লালসাটা দলের সমর্থক-কর্মীরা মোটেই ভালোচোখে দেখছেন না। কাঁথি দক্ষিণে বিজেপির দ্বিতীয় স্থান দখল করাটা সম্ভব হয়েছে বামকর্মীদের আদর্শহীন দলীয় নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার জন্য। তৃণমূল দুর্নীতিবাজদের দল। এই দলকে ভোট দেওয়ার অর্থ দুর্নীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। বিজেপির বিরুদ্ধে একটিও দুর্নীতির অভিযোগ নেই। এমনকী দিদিভাইও সেই অভিযোগ করতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সিবিআই তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূলের নেতাদের ঘুষকাণ্ড নিয়ে।

গূঢ় পুরুষের কলম

কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে দলের কর্মীসভায় দিদিভাই ১১ জন 'ঘুষুড়ে' নেতাকে উঠে দাঁড়াতে বলে তাদের সঙ্গে কর্মীদের পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন, সিবিআই ১২ জনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক চার্জশিট দিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন শুভেন্দু অধিকারী আসেননি।

বাংলার মানুষ ধীরে ধীরে বুঝছেন যে সূর্য মিশ্রদের মতো মমতাও ক্ষমতালোলুপ নেত্রী। দল যতদিন থাকবে ততদিন তিনিই দলের চেয়ারপার্সন। দলের ঘুষুড়ে নেতারা যাতে তাঁর ক্ষমতাকে ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ করার ষড়যন্ত্র করতে না পারেন তার জন্যই তিনি কর্মীসভায় ধুষুড়েদের উঠে দাঁড় করিয়ে ঘাড় হেঁট করার নির্দেশ দেন। জেলবন্দি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যতে লেফট-রাইট মার্চ করতে করতে বীরের মতো কলকাতায় ফিরবেন সে আশ্বাসও নেত্রী কর্মীদের দিয়েছেন। দিদিভাই বাংলার মানুষকে বোকা নির্বোধ বলে মনে করছেন। সুদীপবাবু দলীয় আদর্শ রক্ষার রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেলযাত্রা করেননি। দিদির স্নেহধন্য এই নেতা রোজভ্যালি চিটফান্ডের চুরির টাকা হজম করার অভিযোগে বন্দি হয়েছেন। বাংলার মানুষের স্বার্থে লড়াই করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হননি। একই অভিযোগে দলের সাংসদ এবং 'চন্দননগরের মাল' বলে নিজেকে জাহির করা তাপস পাল জেলবন্দি। দিদিভাই ভুবনেশ্বর ছুটে গেলেন সুদীপদাকে দেখতে। অথচ বেচারি তাপস পালকে সান্ত্বনা দিতে একটি বাক্যও খরচ করলেন না। সন্দেহ নেই তৃণমূল দলটি একটি লুঠেরাদের দল। নিত্যদিন খবরের কাগজ খুললে দেখবেন বালির খাদানের দখল নিয়ে, জমির দালালি নিয়ে অথবা এলাকা দখল নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী লড়াইয়ের বলি হচ্ছে দলের সমর্থক-কর্মীরা। আইন শৃঙ্খলার এমন অবনতি নকশাল আমলের পরে বাংলার মানুষ আর দেখেনি। দিদিভাই যে সত্যটি বুঝেও না বোঝার ভান করছেন তা হচ্ছে মানুষ আর তৃণমূলকে বিশ্বাস করছেন না। মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। পায়ের তলা থেকে মাটি সরছে। তাই বিজেপিকে রুখতে সিপিএমকে পাশে পেতে চাইছেন। সিপিএম চরিত্রভ্রষ্ট আদর্শহীন দল। সূর্যবাবুদের মন্ত্রী করার লোভ দেখালে তাঁরা মার্কসবাদকে বরবাদ করে তৃণমূলের সঙ্গে সখ্য করবেন। সেক্ষেত্রে সিপিএম সমর্থকরা নিশ্চিতভাবে আলিমুদ্দিনের নেতাদের পাশে থাকবেন না। থাকাটা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, আগামীদিনে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূলের মহাজোট বাংলার মানুষ দেখবেন কি? ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় এটা দিদির আকাশকুসুম কল্পনা। বাস্তবে এমন জোট সম্ভব নয়। সিপিএম কর্মী সমর্থকরা এতটা মূর্খ নন যে তাঁদের 'বুঝিয়ে বাজিয়ে' তৃণমূলের পক্ষে আনা যাবে। আসলে তৃণমূলের নেতারা যত সহজে বিক্রি হন ততটা সহজে বামপন্থী সমর্থকদের কেনা যায় না। সূর্য মিশ্ররা বিক্রি হতে পারেন। কিন্তু সাধারণ বাম কর্মীরা নন।

পুনঃ--- কলকাতার সল্টলেকের তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা অনুপম দত্ত সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাই শুধুই বামকর্মী সমর্থকদেরই নয়, দিদিভাইকে নিজের দলের লোকজনদেরও 'বুঝিয়ে-বাজিয়ে' ধরে রাখতে হবে। কথায় আছে, চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম। ■

দিল্লি এবার দিদির, অঙ্কটা দেখে নিন

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার
৭, লোক কল্যাণ মার্গ, নয়াদিল্লি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

প্রণাম নেবেন। আমি বাংলার এক পোড়া-কপাল নাগরিক। আপনি দেশে নানা প্রকল্পের সুযোগ দিলেও আমার রাজ্য সেই সব সুযোগ নিতে রাজি নয়। নীতি আয়োগের বৈঠকে আমার রাজ্য অংশ নেয় না। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এক অন্য অঙ্ক দেখছি। সেই অঙ্কে ২০১৯ সালের ভোটে দিদিই বসছেন দিল্লির তখ্‌তে।

ওড়িশার জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক থেকে আপনারা জানিয়ে দিয়েছেন এ বার লক্ষ্য 'বিজেপি-যুক্ত' ভারত। অর্থাৎ দেশ জুড়ে শুধুই বিজেপি-র রাজত্ব থাকবে। আর আলোচনায় এ কথাও নাকি উঠে এসেছে যে, বিজেপি-র 'স্বর্ণযুগ' আনতে একমাত্র বড় বাধা মমতা। খবরের কাগজে যা পড়েছি সেটাই বলছি। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র কট্টর বিজেপি-বিরোধী দল যারা একটি রাজ্য সরকার চালাচ্ছে। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার পুরভোটের ফলের পরে প্রায় নখ, দাঁত খুইয়েছে। অন্য দিকে নারদ, সারদায় ক্ষতবিক্ষত তৃণমূল কংগ্রেস এখন করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে মুডে।

মমতা আগেই বলে দিয়েছিলেন, বিজেপি বাংলাকে টার্গেট করলে, তিনিও দিল্লি টার্গেট করবেন। কিন্তু বাংলার বাইরে যার শক্তিই নেই, সেই মমতা কী করে দিল্লি শাসনের স্বপ্ন দেখছেন?

মমতা চাইছেন বিজেপির বিরুদ্ধে সব আঞ্চলিক দলগুলি একজোট হোক। সব আঞ্চলিক দলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করে সবাই একসঙ্গে চলুক। ওড়িশাতে গিয়ে তিনি সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সময়ও চেয়েছিলেন। সময় পেয়েছেন কিন্তু রাজনীতির কথাই নাকি হয়নি। নাকি, নবীন কথাই বলতে চাননি! এছাড়া দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গেও মমতা যোগাযোগ রাখছেন। সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে বৈঠক করেছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের সঙ্গেও।

মমতাদিদির থিওরি হচ্ছে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে আঞ্চলিক দলগুলি একজোট হলে তাও বিজেপি-কে একটা চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া যাবে। যেমন ভাবে বিহারে লালু-নীতীশ-কংগ্রেস মহাজোট করে বিজেপি-কে আটকেছিল। আবার উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ- মায়াবতী একজোট হতে পারেনি বলে বিজেপি অ্যাডভান্টেজ পেয়েছে। তাই মমতার এই আহ্বান।

এই কারণেই তিনি আঞ্চলিক দলগুলির নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। এর আগে 'ফেডারেল ফ্রন্ট' তৈরি করে সব আঞ্চলিক দলকে এক ছাতার তলায় আনার প্রক্রিয়া সফল হয়নি। মমতা আবার সেই প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু কোন অঙ্কে!

এই অঙ্কের নাম 'যদি' অঙ্ক।

বিজেপির হাতেই এখন দেশের রাজনীতির ছড়ি। সেখানে অনেকগুলো অবাস্তব 'যদি'-কে বাস্তব ধরে নিলেই দিদি ক্ষমতায়। ধরা যাক, বামেরা বিজেপি বিরোধী বলে তারা মমতার হাত ধরল। ধরা যাক, মায়া-অখিলেশও একজোট হয়ে দিদির দলে ঢুকে গেল। নীতীশ কুমার সার সত্য বুঝে এখন কট্টর কেন্দ্র-বিরোধিতা থেকে সরে গিয়েছেন। ধরা যাক, নীতীশ ফের নিজের পায়ে কুড়ুল মারলেন। নবীন বা ডিএমকে-র করুণানিধি আগে এনডিএ-র সঙ্গে ছিলেন। অতীত ভুলে তারা মমতা জোটে শামিল হয়ে গেলেন। কেজরিওয়াল তো নীতিগত ভাবে আবার কংগ্রেসের সমর্থনে কোনো জোটে শামিল হবেন না। কিন্তু দিদির আহ্বানে সেটাও হয়ে গেলেন। শিবসেনা বা তেলুগু দেশম পার্টি এনডিএ ছেড়ে দিদির শরিক হলো।

এই অল্প কটা 'যদি' সত্য হয়ে গেলেই দিদি প্রধানমন্ত্রীর আসনে। সব মিলিয়ে তাতেও কটা আসন মিলবে তার অবশ্য কোনো হিসেব নেই। সবাই যদি এক জোট হয় তবে ঠিক কী হবে? এই দুঃস্বপ্নে ভর করেই দিদি দিল্লি দখলের ছক কষছেন। আর তিন বছর ছক কষতে হবে। টার্গেট ২০১৯।

দিদিকে ক্ষমতায় যেতেই হবে। কারণ, ক্ষমতায় না গেল এতগুলো ভাই এবং একমাত্র ভাইপোকে বাঁচাবেন কী করে?

তবে এতটা সময় সিবিআই বা আদালত দেবে কি!

—**সুন্দর মৌলিক**

গেরুয়া ঝড় উঠেছে বাংলায়

উড়ে যাচ্ছে যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয়

প্রবাল চক্রবর্তী

ঝড় উঠেছে খণ্ডিত বঙ্গে। গেরুয়া রঙ্গা সে ঝড়। সে বাউল বাতাসে উড়ে যাচ্ছে যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয়। ধসে পড়ছে পুরোনো যত সামাজিক সমীকরণ। বদ্ধমূল কিছু বিজাতীয় আরোপিত ধ্যানধারণা, যেগুলো বহু বছর ধরে বাঙালিকে আষ্টেপৃষ্টে নাগপাশের মতো জড়িয়ে রেখেছিল, ধীরে ধীরে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলছিল গোটা সমাজটাকে, খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে সেসব। এ যেন এক ঝোড়ো নবীন সূর্যোদয়, বাঙালির পুনর্জন্মের প্রভাতলগ্ন। না, একসঙ্গে এত গেরুয়া পতাকার সমাবেশ আগেও দেখেছি। কিন্তু সে তো কলকাতায়। শহিদ মিনার ময়দানে, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। কিন্তু গত ক'দিন ধরে প্রত্যন্ত বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরের রাস্তায় গেরুয়া রঙের যে ঢল নেমেছে, তা আগে কখনো দেখা যায়নি। হাতে তরোয়াল, রামদা, কুঠার। মাথায় গেরুয়া ফেট্টি। চোখে ধিকিধিকি আগুন, কণ্ঠে রামনামের হুঙ্কার। রাজপথ জনপথ মেঠোপথ জুড়ে শুধু তাদেরই মিছিল।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ, যারা মাটিতে কান পেতে থাকি, তাদের কথা আলাদা। শিকড়হীন কচুরিপানার দলভুক্ত বাংলার তথাকথিত সম্মানিত বুদ্ধিজীবী মহল কিন্তু এই পরিবর্তনে যারপরনাই বিস্মিত। ফেসবুক আর টুইটারে তাঁদের বিস্ময় ও হা-হুতাশ আছড়ে পড়ছে মিনিটে মিনিটে। রামধনু রংধনু হয়ে গেলে এঁরা থাকেন স্পিকটি নট, আকাশি আসমানি হয়ে গেলে এঁদের কিছু আসে যায় না, বাঙালি শাড়ি ধুতি ছেড়ে বোরখা লুঙ্গি পরলে এঁরা আহ্লাদে আটখানা হন। তিনভাগের দুভাগ বাংলায় জলখাবার হয়ে গেছে নাস্তা, জল হয়ে গেছে পানি, সেখানে রবিঠাকুর থেকে জীবনানন্দ সব্বাইকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে, মন্দিরের পূজারি হওয়ার অপরাধে সেখানে নির্বিরোধী বৃদ্ধের গলা কেটে ফেলা হচ্ছে অসীম নৃশংসতায়— সেসব এঁরা দেখেও দেখেন না। শ্যামাপ্রসাদের বলিদানে রক্ষা পাওয়া খণ্ডিত অবশিষ্ট বাংলাটাকেও সেরকম না-বাংলা বানিয়ে না ফেলা পর্যন্ত এঁদের শান্তি নেই। এহেন বুদ্ধিজীবীরা আজ বড়ই বিচলিত। এ কী হয়ে গেল বাঙালির! সবাই একসঙ্গে হিন্দুত্ববাদী হয়ে গেল? হায় হায়! সব মতলব বানচাল হয়ে গেল!

এঁদের হাহাকারের মধ্যে ঘুরেফিরেই কয়েকটা পয়েন্ট লক্ষ্য করছি। যার একটা হলো, বাঙালি দুর্গাপুজো কালীপুজো করে সে ঠিক আছে, কিন্তু রামপুজো কবে থেকে শুরু করল? এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। জেমস ক্যামেরুনের 'অবতার' সিনেমাটা দেখেছেন নিশ্চয়ই। আচ্ছা বলুন তো, সিনেমাটার ওই যে গ্রহব্যাপী জীবন্ত বৃক্ষসত্তা 'এওয়া', যার মধ্যে প্যান্ডোরা গ্রহের প্রতিটি প্রাণের স্মৃতি সমাহিত রয়েছে, সেটা আসলে কী? একেকজনের কাছে এওয়া একেকটা জিনিস। ব্যবসায়ীটির কাছে এওয়া ছিল একটা আপদ, তার মুনাফার পথে বাধা। বিজ্ঞানীটির কাছে এওয়া ছিল শক্তির এক ঘূর্ণি, 'ফ্লাক্স ভর্টেক্স'। গ্রহের আদিনিবাসী নাভিদের কাছে কিন্তু এওয়া হলো তাদের জীবন। তাদের পূর্বজদের সঙ্গে, ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্র। এওয়া হলো নাভিদের আত্মপরিচয়। সিনেমাটা দেখতে গিয়ে মনে হয়েছিল, এওয়া যেন ঠিক আমাদের শ্রীরামচন্দ্র। কারোর কাছে তিনি আপদ, কারোর কাছে বিপদ। কেউ বলে তিনি উপকথা মাত্র। আমাদের কাছে কিন্তু তিনি চিরজীবী, সদাজাগ্রত। তিনি আমাদের ইতিহাস, আমাদের বিবেক, আমাদের সুপ্ত বিজিগীষা। বাঙালি কবে রামভক্ত ছিল না? সাধক রামপ্রসাদ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁদের নামের রামনাম কি বাইরে থেকে এসেছে? হাওড়ার রামরাজাতলায় একশো পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রাচীন রামমন্দির কি বাঙালির নয়? তাছাড়া, রাম আর কালী কি আলাদা? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সাপ শুয়ে থাকলেও সাপ, তা হিলহিলিয়ে চললেও সাপ--- একটাকে মানবি, অন্যটাকে মানবি না, সেটা কি হয়? রাম আমাদের আত্মপরিচয়, আমাদের নাড়ির টান। আমাদের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল পরম্পরার সঙ্গে যোগসূত্র। সেজন্যই রামনামে বারবার কেঁপে ওঠে ধরাধাম। উথালপাথাল হয় জনমানস। রামনামে শতাব্দীর আলস্য কাটে, কাণ্ডজ্ঞান জাগে। যেমনভাবে এওয়ার মাহাত্ম্য বোঝার ক্ষমতা ছিল না অর্থলোভী সেই ব্যবসায়িটির, তেমনভাবেই রাম যে কী, সেটা বোঝার ক্ষমতা নেই ওইসব ভুঁইফোঁড় বুদ্ধিজীবীদের।

এইসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একদল যাদবপুর-বিলাসী। মুখে স্লোগান— 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে', এঁরা আজও দেশলাই দিয়ে দাঁত মেজে বিপ্লব করার স্বপ্ন দেখেন।

এঁদের বক্তব্য, রামনবমীতে খোলা তরবারি হাতে দলে দলে মিছিল করার ফলে বাঙালির নাকি জাত চলে যাচ্ছে। এরকম চললে খুব শিগগিরই নাকি বাঙালিরা সব ইউপিওলা হয়ে যাবে। যাঁরা এসব বলছেন, তাঁরাই আবার দিল্লি থেকে ধার করা হিন্দি স্লোগান দিয়ে যাদবপুরে গলা সাধেন। তাতে বাঙালির বাঙালিয়ানা যায় না? রাশিয়ার যুদ্ধ আমার যুদ্ধ, চীনের চেয়ারম্যান আমার চেয়ারম্যান, ভুলতে পারি বাপের নাম ভুলবো নাকো ভিয়েতনাম— এসব নকলনবিশী খুব উমদা দিশি অমৃত, যত দোষ শুধু রামনবমীর বেলাতেই? বাঙালির ছদ্মবেশে এরা আসলে জেহাদি ওয়াহাবি সালাফিদের দালাল। ছাগলাদ্য-সেবী এইসব বুদ্ধিজীবীরা জানেন না, রামনবমী অর্থাৎ বাসন্তী পুজোর দিন ঢাল তরোয়াল লাঠি সড়কি নিয়ে মিছিল করার কায়দাটা আমরা বাঙালিরাই ভারতবাসীকে শিখিয়েছিলাম। যাঁরা স্বাধীনতার আগে জন্মেছেন, তাঁরা হয়তো মনে করতে পারবেন, শারদীয়া দুর্গাপূজার অষ্টমীতে পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে শস্ত্রপূজা হোত। হোত লাঠিখেলা, ছোরাখেলা। তাই বলা হোত, বীরাষ্টমী। অগ্নিযুগে এভাবেই আমরা ইংরেজদের চমকাতাম। তারও আগে সুলতান হোসেন শাহর সময় নবদ্বীপের কাজি যখন সংকীর্তন নিষিদ্ধ করেছিল, বাঙালি তখন চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে মশাল হাতে সশস্ত্র মিছিল করেছিল নবদ্বীপের পথে। কাজির বাড়ি অবরোধ করেছিল। ভয়ের চোটে সংকীর্তনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছিল কাজি। অস্ত্র হাতে মিছিল বাঙালির প্রাচীন পরম্পরা। গান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংসা কোনোকালে বাঙালির পরম্পরা ছিল না। প্রণবানন্দের হাতে চিরকাল ত্রিশূল শোভা পেয়েছে, বিবেকানন্দের হাতে লাঠি। এটাই বাঙালির পরম্পরা। সঙ্কটের মুহূর্তে বাঙালির সেই প্রাচীন চরিত্রই পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, নেতাজীকে কুকুর বলেছিল, রবিঠাকুরকে বলেছিল বুর্জোয়া, বিদ্যাসাগরকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল, শ্রীরামকৃষ্ণকে মৃগী রুগি আর বিবেকানন্দকে বেকার যুবক, তারা আজ বাঙালিকে শেখাচ্ছে বাঙালিয়ানা। মুসলিম লীগের সঙ্গে ধর্মতলায় মিটিং করে যারা বলেছিল, বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতকে তারা স্বাধীন হতে দেবে না, তারা বাঙালিকে বলে দিচ্ছে কিসে বাঙালির ভালো হবে। এর থেকে হাস্যকর আর কিই বা হতে পারে। খুশির কথা হলো, এদের কথা কেউই আর শুনছে না। গত ক'দিন ধরে এরকম কিছু গাঁয়ে-মানে- না-আপনে-মোড়ল বুদ্ধিজীবীর ফেসবুক ফলো করছি। এঁদের পোস্টগুলোর জবাবে সাধারণ মানুষ যেভাবে চাঁছাছোলা ভাষায় এঁদের গালিগালাজ করছেন, তা পড়ে দিব্যি বুঝতে পারছি, হাওয়া কোনদিকে বইছে।

আরেকদল বুদ্ধিজীবী, যাঁরা মূলত নবান্নসেবী, তাঁরা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গ হলো এক স্বর্গরাজ্য। এখানে সবকিছুই আইনমাফিক চলে। এহেন স্বর্গরাজ্যে অস্ত্র নিয়ে মিছিল নাকি দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা বই কিছু নয়। এইভাবে শস্ত্র নিয়ে মিছিল নাকি সংবিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী। বাহ্! চমৎকার! আজ এঁদের সংবিধানের কথা মনে পড়েছে, এটা খুব ভালো কথা। তা, পশ্চিমবঙ্গে সংবিধানের শাসন রয়েছে কি? ধুলাগড়ে সংবিধান কোথায় ছিল? দেগঙ্গায়? মল্লারপুরে? কালিয়াচকে পুলিশ যখন থানা ছেড়ে পালিয়ে

যাঁরা স্বাধীনতার আগে জন্মেছেন, তাঁরা হয়তো মনে করতে পারবেন, শারদীয়া দুর্গাপূজার অষ্টমীতে পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে শস্ত্রপূজা হোত। হোত লাঠিখেলা, ছোরাখেলা। তাই একে বলা হোত বীরাষ্টমী।

গিয়েছিল, তখন কে সেখানে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করছিল? পশ্চিমবঙ্গে সংবিধানের নয়, আইনের নয়, জেহাদিদের রাজত্ব চলছে, মাৎস্যন্যায়ের রাজত্ব চলছে। জোর যার মুল্লুক তার, এটাই এখানকার আইন। আর বলুন তো, দেশের কোথাও যদি আইনের শাসন অন্তর্হিত হয়, সেখানে কি আর সংবিধানের শাসনের দোহাই দেওয়া যায়? মানুষ সেখানে তো আত্মরক্ষার্থেই শস্ত্র তুলে নেবে হাতে, তাই না? তাছাড়া, আইন রক্ষার দায়িত্বটা বারবার কেন হিন্দুদেরই ওপর বর্তায়, কে জানে। ধুলাগড়ে নবিদিবসের সশস্ত্র মিছিল থেকে হিন্দুদের বসতির ওপর আক্রমণ হলো, বিনা প্ররোচনায়। হিন্দুদের বসতি লুঠ হলো। তাতে কারোর কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। পাশাপাশি সারা রাজ্য জুড়ে হিন্দুরা অস্ত্র নিয়ে মিছিল করল, একটাও কি দাঙ্গা হয়েছে তার থেকে? আমাদের এই সংযমের প্রশংসা হওয়া তো দূরস্থান, উল্টে বেছে বেছে হিন্দুদের ওপরই অস্ত্র আইনে মামলা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই বিমাতৃসুলভ আচরণই পশ্চিমবঙ্গকে আজ এমন অশান্ত করে তুলেছে।

বাঙালি ভোলা মহেশ্বর, সিদ্ধি খেয়ে শ্মশানে পড়ে থাকে, কেউ মাড়িয়ে চলে গেলেও রাগে না। তার মানে এই নয় যে, সবাই তাকে প্রতিদিন মাড়িয়ে যাবে। নোবেলসেবী এক বামাচারী অর্থনীতিবিদ বলেছেন, পার্টিশন করে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু তাড়িয়ে নাকি ভূমিসংস্কার হয়েছে। হিন্দুরা ছিল বড়লোক জমিদার বুর্জোয়া, তাদের ঠকিয়ে তাড়িয়ে গরিব মুসলমানরা জমি দখল করেছিল, তাই দেশভাগ একটা বিপ্লব। নোবেলের বদলে বেল পাড়লে ওঁর কথা কে শুনত, জানি না। কিন্তু ঘটনাচক্রে ন্যাড়ার বেলতলায় যাওয়ার মতো উনিও নোবেলতলায় একবার গোঁত্তা খেয়েছেন, তাই ওঁর তত্ত্বকথা প্রচার পায়। সে তত্ত্বকথার আড়ালে আমাদের পূর্বপুরুষদের উনি এতবড় অপমান করেছেন, সেটাও আমরা সয়েছি! কিন্তু অপমানের তো সেখানেই ইতি হচ্ছে না!

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবছরের বাজেটে মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ দু'হাজার আটশো পনেরো কোটি টাকা। পাশাপাশি পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি, ক্ষুদ্র মাঝারি ও ভারী শিল্প— সব মিলিয়ে বরাদ্দ তারচেয়ে কম, দু'হাজার একশো চুয়ান্ন কোটি টাকা। লাগাতার অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের জনতাত্ত্বিক ভারসাম্যকে বদলে দিয়েছে। ইমামদের জন্য ভাতা, পুরোহিতদের জন্য কাঁচকলা। মাদ্রাসার জন্য অনুদান, সরস্বতী শিশুমন্দিরকে অর্ধচন্দ্র। এককালে বাংলায় ইসলামের পরম্পরা ছিল আউল বাউল সুফি কেন্দ্রিক, তাকে হটিয়ে সালাফিদের প্রতিপত্তি বাড়ছে। আগে বাংলার মুসলমান শিশুরা ইসলাম শিখতো তাদের বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে। তার জায়গা নিয়েছে সৌদি থেকে আগত সালাফি শিক্ষকরা। তাদের জন্য বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আলিশান দুর্গসমান মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে সৌদি অর্থে ও মমতাময়ী প্রশাসনের বদান্যতায়। সেখানে শুধু গোঁড়ামিই শেখানো হয়। সেখানে শিশুরা শেখে— ভারতমাতা হারাম, রামভক্তি বুটপরস্তি, হিন্দুরা কাফের। এককালে যে বাংলায় হিন্দুর পুজোয় মুসলমানরা ঢাক বাজাতো, সেখানে গোঁড়াদের নির্দেশে মাতৃপূজায় বাধা দিচ্ছে প্রশাসন। সরস্বতী পুজো করার অপরাধে ফুলের মতো শিশুদের ওপর লাঠিচার্জ হচ্ছে। মণ্ডপ থেকে মায়ের বিগ্রহ উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। পরিস্থিতি আজ বাঙালি হিন্দুকে ভাবতে বাধ্য করছে, পার্টিশনের সময়কার পরিস্থিতি কি আবার তৈরি হচ্ছে? লক্ষ মানুষের প্রাণহানি, লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানি, ধর্মের নামে মানুষ খুন আবারও কি ভূমিসংস্কার আখ্যায়িত হবে? এই আশঙ্কা থেকেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাঙালি। ভোলা মহেশ্বর ত্রিনেত্র খুলেছে। বাঙালি খেপেছে। না, আমরা দাঙ্গাবাজ নই। আমরা হিন্দু, তাই আমরা ধর্মনিরপেক্ষ। আমরা তো চাই, প্রতিটি সামাজিক উৎসব আমাদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে। ওরা আমাদের উৎসবে ঢাক বাজাবে, আমরা ওদের উৎসবে সিমুই খাবো। আমাদের ধর্মে বলেছে 'সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ'।

পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম সেকথা বলেনি। আমরা সবাইকে নিয়ে চলি। কাউকে বাদ দিই না। কিন্তু কেউ যদি বলে, সবাইকে মেরেকেটে ধর্মান্তরিত করে গোটা পৃথিবীটাকেই নিজেদের মতো করে নেবে, তাদের জন্য আমাদের হৃদয়ে কোনো স্থান নেই। তাদের আমরা মুছে ফেলবো সমাজ থেকে। আমরা বহুত্ববাদের পূজারি, তাই যারা বহুত্ববাদকে মুছে ফেলতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের কর্তব্য। সেটা দাঙ্গা নয়, আত্মরক্ষা। সোরাবর্দির মুসলমান উগ্রবাদ, তার ডাইরেক্ট অ্যাকশনের গণহত্যার প্রতিবাদে গোপাল পাঁঠাদের মতো মানুষেরা হাতে রামদা কাটারি বন্দুক নিয়ে নেমেছিলেন রাস্তায়। আজ আবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া বাঙালি হিন্দুসমাজ এক ধাক্কায় বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

লাল-বাল-পালের হাতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দু মহাসভার। তাঁদের হাত ধরেই সূত্রপাত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের। আজকের এই যে দেশজোড়া হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন, তার গোড়াপত্তন কিন্তু বাঙালিরই হাতে। নিজের অক্ষয় সম্পদের ভাণ্ডার অবহেলায় ফেলে রেখে আমরা পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়িয়েছি বহুদিন। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ যে পথ ভারতবর্ষকে দেখিয়েছিলেন, আমরা সে পথ ভুলে মস্কো বেজিং তাশখন্দ টিম্বকটু ঘুরে মরেছি। হাঁড়ির হাল হয়েছে আমাদের তাতে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, দেরিতে হলেও বাঙালির সম্বিত ফিরেছে। অনেক হলো মার্ক্স-মওদুদী, এখন বাংলায় ফেরা যাক, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীতে।

(লেখক একজন প্রবাসী বাঙালি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া)

চীনের বিরোধিতাই ভারতের এন এস জি সদস্য লাভে বাধা

দেবীপ্রসাদ রায়

এন এস জি অর্থাৎ Nuclear Supply Group ---কথাটি আমাদের দেশে সাম্প্রতিক বৎসরাধিককাল ধরে বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। যখন ১৯৭৪ সালের মে মাসে সারা বিশ্বকে হতচকিত করে ভারত তার প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণ (আসলে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ যুক্ত অন্তর্বিস্ফোরক বা implosion ছিল এটি) ঘটাল তখনই অস্বাভাবিক দ্রুততায় কয়েকটি পরমাণুশক্তিধর দেশ উন্নয়নশীল ভারতের পরমাণুচর্চার দর্শন ও কর্মসূচিকে অগ্রাহ্য করে, প্রতিরক্ষা নিয়ে তার বাস্তব উদ্বেগকে তুচ্ছ করে এই এন এস জি গঠন করে প্রধানত যেন ভারতকে অবদমিত করতেই। ঠিক কিছুদিন আগে চীন পরমাণুর বিভাজন-সংযোজন দু' ধরনের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল বেশ কয়েকবারই। পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলি চেয়েছিল এন এস জি গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি তাদের গোষ্ঠীর বাইরে পরমাণু প্রযুক্তি, জ্বালানি, কৃৎকৌশল সরবরাহ করবে না। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকেই এই গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রসার রোধ করার প্রয়াস ছিল যদিও দু' একটি বাদে কোনো প্রয়াসই আন্তরিক ছিল না, প্রথমাবধিই সুপ্ত ছিল। ইতিমধ্যে স্বীকৃত পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলির নিজেদের একাধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা, বিশ্বের বাকী দেশগুলিকে তাদের মুখাপেক্ষী করে তোলা ও রাখার মানসিকতা। ভারতের মতো বিশাল দেশে বিদ্যুতের চাহিদা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতার কারণে পরমাণু প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT) অথবা Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)-তে ভারত সই করেনি। ভারতের

পক্ষে সদর্থক প্রস্তাব ছিল, তার আগে পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলির ওইসব অস্ত্রাদি ধ্বংস করা হোক। কিন্তু সে প্রস্তাবে ওই দেশগুলি রাজি হয়নি। কেন? কারণ তাদের নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আর ঠিক সেজন্যই অস্ত্রপ্রসার বিরোধী প্রয়াসগুলি আপাতভাবে কার্যকরী থাকলেও আন্তরিক ভাবে ছিল না। বিশ্ববাসী এই নামগুলি তো জানে— চীন-পাকিস্তান-কোরিয়া-আব্দুল কাদের খান শিবিরে। নেপথ্যে আমেরিকা! শান্তি ও মানব কল্যাণের কাজে পরমাণু গবেষণায় ভারতের দীর্ঘকালীন সংযুক্তি পরীক্ষিত সত্য হলেও তার প্রতি সহানুভূতি, কূটনৈতিক রাজনৈতিক লাভালাভের হিসেবেই আবৃত ছিল। এই কূটনৈতিক-রাজনৈতিক বাণিজ্যিক হিসেবের নতুন মূল্যায়নই আমেরিকাকে প্রণোদিত করেছে ভারতের এন এস জি-তে অন্তর্ভুক্তির প্রয়াসকে সমর্থন করতে। কেন? এন এস জি প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের আগে ভারতের অবস্থানটা তুলে ধরা উচিত।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার উৎসাহ এবং উদ্যোগে ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রশাসনিক সার্বিক সহযোগিতায় ভারতে পরমাণু গবেষণা এবং প্রযুক্তি বিকাশের সূচনা হয়। বিশ্বের দেশগুলি তাদের কৌতূহলের কেন্দ্র বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর দেশ ভারতের উপর, বুদ্ধ-গান্ধীর দেশ ভারতের উপর আস্থা প্রদর্শন করেছিল। আস্থা প্রদর্শন করেছিল তার ভূমিকার উপর। তাদের স্মরণে ছিল বার্ট্রান্ড রাসেল-এর উদ্যোগে পরমাণু অস্ত্রবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১৯৫৫ সালে ৯ জুলাই লন্ডনের বিখ্যাত কক্সটন হলে যে সমাবেশ হয়েছিল সেটি নেহরুর আগ্রহে ভারতে হওয়ার কথা ছিল। উদ্ভূত সুয়েজ- সংকটের কারণে তা ভারতে হতে পারেনি। লন্ডনের সেই সমাবেশে উপস্থাপিত ম্যানিফেস্টো যা আইনস্টাইন-রাসেল ম্যানিফেস্টো নামে পরিচিত পরমাণু অস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে, তা থেকেই শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে Pugwagh-Conference on Science and World Affairs. কক্সটন হলে উদ্বোধনী ভাষণের শেষে বার্ট্রান্ড রাসেল কাতর আহ্বান জানিয়েছিলেন —বিভিন্ন দেশের উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে, 'Remember Humanity and Forget the rest.' এরই সূত্র ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ১৯৫৫ সালের ৮ আগস্ট এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে জেনেভাতে। সম্মেলন চলেছিল ২০ আগস্ট অবধি। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ড. হোমি ভাবা। সভাপতির ভাষণে ড. ভাবা বলেছিলেন, 'উন্নয়নশীল দেশগুলির সমৃদ্ধির জন্য পরমাণুশক্তি এক সংক্ষিপ্ততম পথের সন্ধান দেবে যে পথের খোঁজ শিল্পোন্নত দেশগুলি এতদিনে পেয়েছে। এই সম্মেলনে তৎকালীন বিশ্বের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের বৃহত্তম সমাবেশ ঘটেছিল--- প্রতিনিধি ছিলেন প্রায় ১৫০০, গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়েছিল সহস্রাধিক। সম্মেলনে জোর দেওয়া হয়েছিল শান্তির কাজে বিশেষ করে বিদ্যুৎ

উৎপাদনের কাজে পরমাণুশক্তি ব্যবহারের উপর। তখনই মাথায় এসেছিল আই এ ই এ (International Atomic Energy Agency)-র মতো একটি সংস্থা গড়ে তোলার কথা। এটি আনুষ্ঠানিক ভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল ১৯৫৭ সালের ২৯ জুলাই। তার আগে ভারত-সহ ১২টি সদস্য দেশ নিয়ে এক কার্যকরী গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের ২০ অক্টোবর এর স্ট্যাটিউট ঠিক করা হয়। ১৯৫৭ সালে সদস্য দেশ হিসেবে ভারত এক সাংগঠনিক সূত্রের প্রস্তাব দেয় যা সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকরী হয় এবং তা এখনো অবধি অনুসৃত হচ্ছে। এই সূত্রানুযায়ী গোটা বিশ্বকে ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয় : উত্তর আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং দূরপ্রাচ্য। আইএইএ-র গঠনতন্ত্রে এই সূত্রটি ধারা ৬এ থেকে ৬সি-তে বিধৃত আছে। গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত এক সভাতে হেডকোয়ার্টার হিসেবে জেনেভা, কোপেনহেগেন এবং রিও-ডি- জেনেরা প্রবল দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও ড. ভাবার পছন্দমতো ভিয়েনাকে বাছা হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে কানাডার ড. লুইস-এর সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল 'সাক' (SAC : Scientific Advisory Committee)। এই 'সাক'-এর সভাতে যোগ দিতে গিয়েই ১৯৬৬ সালে রহস্যজনকভাবে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন ড. ভাবা। ভিয়েনায় আইএইএ-র হেড কোয়ার্টারের সামনে ভাবার অবদানের স্বীকৃতিতে তাঁর আবক্ষমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এত কথা বলা হলো এটা জানাতে যে পরমাণু-অস্ত্র বিরোধী বিশ্ব আন্দোলনে ভারতের সংযুক্তি প্রথম থেকেই কতটা নিবিড় ও আন্তরিক ছিল।

পরমাণুশক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পথ সুগম করার জন্য ভাবার আনুষ্ঠানিক প্রয়াসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে ভারতের পরমাণু চর্চা ও গবেষণা। বিশ্বে পরমাণুচর্চার বিবেচ্য বিষয় Benefit Cost ratio (উপকার-মূল্য অনুপাত) ছিল গুরুত্বপূর্ণ— একটি দেশের অগ্রসর হওয়ার জন্য। তৎকালীন একটি সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছিল— এই অনুপাত ছিল : ব্রিটেন ০.০৬, ফ্রান্স ০.১২, আমেরিকা ০.২৮, রাশিয়া ০.৪১, চীন ০.৪৮ এবং ভারত ০.৫৬ অর্থাৎ ভারতই সবচেয়ে অনুকূল দেশ। সেটি মাথায় রেখেই ভাবা তাঁর কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে এশিয়ার ও ভারতের প্রথম পরমাণু চুল্লী 'অপ্সরা' যখন প্রাণচঞ্চল হলো তখন পরমাণু গবেষণায় চীন ভারতের তুলনায় ১০ বছর পিছিয়ে ছিল। সামরিক লক্ষ্যকে পাখির চোখ করে সেই চীন তার পরমাণু কার্যক্রমকে সেইমতো সাজিয়ে ১৯৬৪ সালের পরমাণু বিস্ফোরণে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকল এবং ইতিমধ্যে চীন আক্রমণে বিপর্যস্ত ভারতের জন্য উদ্বেগ এবং আশঙ্কার সৃষ্টি করল। পরমাণু অস্ত্রধর মাতব্বর দেশগুলি একরকম উদাসীনই থেকেছে চীনের ব্যাপারে। উপরন্তু আর কোনো দেশ, বিশেষ করে ভারত যাতে পরমাণু অস্ত্রধর হয়ে চীনের মোকাবিলা না করতে পারে তার জন্য ১৯৬৮ সালে Nuclear Non- Proliferation Treaty (NPT)-র মাধ্যমে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং নতুন ভাবে পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হওয়া চীন-সহ ১৯১টি দেশ একত্রিত হলো। চীন- পাকিস্তানের বৈরিতা এবং ভারত কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কূটনৈতিক অভিসন্ধির স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট আভাসের কারণে ভারত ওই এনপিটি চুক্তি অথবা পরে Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)-আওতায় আসেনি। কারণ পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ এবং মানবকল্যাণমুখী কাজে লাগানো সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে যে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে ভারত স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে অগ্রসর হচ্ছিল তা ব্যাহত হবেই। নানা ভাবে বাধা আসছিলই--- এমনকী সহায়ক বলে ভাবা কিছু দেশ থেকেও। কতকগুলি ঘটনা ভুলে যাওয়ার মতো নয় : CIRUS পরমাণুচুল্লী থেকে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের হঠাৎ করে চলে যাওয়া, বিমান দুর্ঘটনায় রহস্যজনক ভাবে ড. হোমি ভাবার মৃত্যু, কিছুদিন পরেই ভারতের এটমিক এনার্জি কমিশনের ভাবা-পরবর্তী চেয়ারম্যান মহাকাশ গবেষণায় সাফল্যের কারিগর ড. বিক্রম সরাভাইয়ের খুন হয়ে যাওয়া— ভারত পরমাণু বোমার দিকে যাচ্ছে সন্দেহে তারাপুর পরমাণু চুল্লীর জ্বালানি সরবরাহ চুক্তিভঙ্গ করে বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি। তবুও ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদদের নিষ্ঠার এবং উপযুক্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও সহায়তায় ১৯৭৪ সালের ১৮ মে পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ সংঘঠিত হলো— বিস্মিত হলো বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল, তেজস্ক্রিয়তা সীমিত করা হলো অন্তর্বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। আবার ঠিক তার পরের বছর ১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল মহাকাশে উঠলো প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'। আশ্চর্যের কথা এই যে ভারতের প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণ পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সংগঠিত হলো Nuclear Supper Group বা এন এস জি যার উদ্দেশ্য হলো ভারতের পরমাণু চর্চার পথ আটকানো কারণ তার ইউরেনিয়াম জ্বালানি ভাণ্ডার অত্যন্ত কম, বিশ্বের মাত্র ১ শতাংশ। সে যাতে জ্বালানি সংগ্রহ করতে না পারে, যাতে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করতে না পারে। তাদের হিসেব অনুযায়ী সেক্ষেত্রে ভারতকে এন এস জি-র সদস্য হতেই হবে বর্তমানের ৪৮ জন সদস্য দেশের সঙ্গে এবং তার পূর্ব শর্ত হিসেবে এন টি পি চুক্তিতে আসতে হবে অর্থাৎ পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধ আন্দোলনের সঙ্গে প্রথমাবধি ভারতের আন্তরিক সংযুক্তি— এন পি টি এবং সিটিপিটি'র আওতায় বাইরে থাকা তার কতটা দরকার তা জানা সত্ত্বেও তার এন এস জি-তে অন্তর্ভুক্তি বিশেষ একটি দেশের আপত্তিতে আটকে যাচ্ছে কেন? কেন ভারতের সদর্থক ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে বার বার?

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যাপক ব্যবহারের জন্যই এই শক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রয়োজন বলেই ১৯৯৮ সালে সেই পোখরানে ভারত আরেকবার কয়েকটি পরমাণু বিভাজন ও সংযোজন পরীক্ষা করে সাফল্যের সঙ্গে। তার প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার নেতৃত্বেই প্রধানত, ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার জন্য কয়েকটি

নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বিপুল জনসংখ্যার দেশ ভারতের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। সবিস্ময়ে আমেরিকা এবং তার অনুবর্তী দেশগুলি দেখেছে ভারতে জি ডি পি ১৯৯৮ সালে শতকরা ৪.৮ থেকে ২০০১ সালে হয়ে গেছল শতকরা ৬.৬। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে পরমাণু অস্ত্রধর করে তোলার চোরা পথ যারা গ্রহণ করেছিল তারা ক্রমশ বুঝতে পারল পাকিস্তান হয়ে সেই অস্ত্র বিশ্বে ত্রাস সৃষ্টিকারী ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েই চলেছে। এ বোধোদয় আমেরিকার হলো ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর World Trade Centre-এ এবং অন্যান্য জায়গায় নারকীয় জঙ্গিহানার পর। বহু সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিহানার পর এটা উপলব্ধ হলো পরমাণু প্রযুক্তি কিছু পরিমাণ হলেও সন্ত্রাসবাদীদের হাতে চলে যেতে পারে কিছু রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকায়। জানা গেছে অসম্পূর্ণ প্রযুক্তির সাহায্যে ক্ষুদ্রাকৃতি বাক্স সাইজের পরমাণু বিক্রিয়া নির্ভর বোমা, Disty Bomb তৈরি করা যেতে পারে এবং তা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা ব্যবহার করতে পারে দেশে দেশে। অত্যন্ত বিষাক্ত ও ক্ষতিকর এই বোমার তুলনা দেওয়া যেতে পারে এই ভাবে : গ্রামের দিকে শোনা যায় বিষধর সাপের ডিম বিকৃতভাবে ফুটে কখনো কখনো 'লেঙ্গুস' নামে সাদা কালো ছিট ছিট খোলসের এক পোকার জন্ম দেয় যা অত্যন্ত বিষাক্ত ও ভয়ানক।

ভারতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা ভুল হয়েছে বলে বুশ প্রশাসন স্বীকার করে তাদের রাষ্ট্রদূত রিচার্ড সেলেঙ্গার মাধ্যমে, এই প্রসঙ্গে— Los Alamos National Laboratory-র প্রাক্তন ডিরেক্টর Dr. Seigfried Hecker-এর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "I found that whereas sanction slowed progress in nuclear energy, they made India Selfsufficient and world leader in fast reactor technology. While much of the World's approach to India has been to limit its access to nuclear technology it may well be that today we limit ourselves by not having access to India's nuclear technology developments. Such technical views shoul help to aduia the diplomatic effects with India."

বস্তুতপক্ষে সর্বক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে তার দক্ষতা, সাফল্য আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। ক্রায়োজিনিক ইঞ্জিন সে তৈরি করে ফেলেছে, সুপার কম্পিউটার 'পরম', বার্কে তৈরি হয়েছে ১২৮ নোডস্ সমন্বিত কম্পিউটার শ্রেণী 'অনুপম', সহায়ক সফ্টওয়্যার অনুনেত্র— ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি'র লক্ষ্যভেদী ক্ষমতা প্রসঙ্গে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত 'It is not only accurate but embarassingly accurate : এই ভারতের বিপুল বাণিজ্যিক বাজার হাতছাড়া যাতে না হয় তার জন্য উদ্বেগে থাকা আমেরিকা ভারতের সাথে পরমাণু চুক্তিতে অগ্রণী হয়েছিল। অন্যদিকে দ্রুত উন্নয়নশীল ভারত বিপুল শক্তি চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরমাণুজাত বিদ্যুতের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আধুনিক প্রযুক্তি চাই, জ্বালানির সরবরাহ চাই, ব্যবহৃত জ্বালানির পুনঃচক্রীকরণ অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ চাই। এসবেরই ফলশ্রুতি পরমাণু চুক্তি ১২৩। দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক ভাবনাচিন্তার পরই এই চুক্তিতে ভারতকে আসতে হয়েছে। ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের নিরিখে পরমাণু বিদ্যুতের জন্যই বাস্তবসম্মত কিছু নমনীয়তা দেখিয়েই এই চুক্তিতে আসতে হয়েছে ভারতকে। এর ফলে তৎকালীন স্থিতিতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৩৭৫ মেগাওয়াট আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় থাকবে এবং ২৩৭৫ মেগাওয়াট থাকবে দেশের সামরিক প্রয়োজনে। ২০১৪ সাল অবধি ২২টি পরমাণু চুল্লির মধ্যে ১৪টি নাগরিক প্রয়োজনে এবং ৮টি সামরিক প্রয়োজনে নির্দিষ্ট করা ছিল। প্রকারান্তরে ভারতকে পরমাণু অস্ত্রধর দেশ হিসেবেই গণ্য করা হলো এই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে। এই চুক্তি প্রসঙ্গে ইউ এস আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নসয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, "The economic benefit is going to be in billions, there is no question about at, because of the huge nature of the Indian economy and the expansion that they are planning in the civilian nuclear energy field. অপরদিকে ভারতের প্রাক্তন এটমিক এনার্জি কমিশন প্রধান চিদাম্বরম বলেছেন— "Overall the agreement is good. Our strategic pro-gramme is unaffected and so is our advanced research and development programmes like fast bruder reactors."

১ আগস্ট ২০০৮ আইএইএ-র এক সভায় বোর্ড অফ গভর্নরস এই চুক্তিকে সমর্থন জানিয়েছে। পাকিস্তান অস্ট্রিয়াসহ কয়েকটি দেশের আপত্তি সত্ত্বেও এন এস জি-ও বিরোধিতা করেনি। অথচ চুক্তি সম্পাদনার পর আজ অবধি এক পাউন্ড ইউরেনিয়ামও আমরা পাইনি আমেরিকা বা এন এস জি সদস্য অন্য কোনো দেশ থেকে। একক ভাবে বিভিন্ন দেশগুলি থেকে আগের চুক্তি মতো কিছু এলেও এদিকে ওই চুক্তির উপর নির্ভর করে ৬টি অতিকায় পরমাণু চুল্লির নির্মাণ কাজে নেমে পড়েছি আমরা। এরকম একটি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের জয়িতাপুরে (ইউরোপিয়ান প্রেসারাইজড বিসক্টর) ১৬৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার। ফ্রান্সের Arava কোম্পানির কারিগরী সহায়তায় হচ্ছে বটে। অর্থাৎ আমরা গভীর সংকট এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছি। ভারতকে চাপ দিয়ে এন পি টি-তে স্বাক্ষর করানোর জন্য কোনো উচ্চস্তরীয় কূটকৌশল কাজ করছে না তো? এন এস জি সদস্যপদ লাভ বিশেষ জরুরি। কারণ--- (১) সদস্য হলে তবেই দ্রুত উন্নয়নশীল ভারত নিউক্লিয়ার উপকরণাদি (nuclear materials) রপ্তানি ও আমদানীর জন্য বৃহৎ আন্তর্জাতিক বাজার পাবে। (২) নিউক্লিয়ার রিএক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত হবে। (৩) নিজস্ব প্রযুক্তিতেই ভারতের পরমাণু প্রকল্পের কাজ চলে। সে কাজে দ্রুততা আনতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি পেতে এন এস জি-র সদস্য হতে হবে। (৪) ভারত তার নিজস্ব প্রযুক্তি বিক্রির জন্য বাজার পাবে। (৫) সদস্য হলে নিউক্লিয়ার বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

বিধি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে।(৬) নিজেদের স্বার্থে এবং বিশ্ব স্বার্থের আবহমণ্ডলে দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারবে।

প্রায় সব এন এস জি সদস্য দেশের আনুকূল্য পেলেও শুধুমাত্র চীনের আপত্তির জন্য ভারতের সদস্যপদ লাভ করা হচ্ছে না— এনপিটি-তে সই করা নাকি আবশ্যক। তাহলে ফ্রান্স কী করে সদস্য পদ পায়? কারণ— এন পি টি-তে সই করাটা Mandatory ছিল না এটি শুধুমাত্র একটি নির্দেশক নীতি ছিল। ভারত এনপিটি ও সিটিপিটি-র উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে অনেকগুলি শর্ত স্বীকার করে এসেছে, যেমন—

(১) ভূগর্ভস্থ পরমাণু বিস্ফোরণ না ঘটানো। (২) পরমাণু অস্ত্রের প্রথম প্রয়োগ না করা। (৩) ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ বা ব্যবহৃত জ্বালানির পুনঃচক্রীকরণ প্রযুক্তি অন্য কোনো দেশকে সরবরাহ না করা।

মেক্সিকোর মতো কিছু কিছু সদস্যদেশ মনে করে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সে দেশের track record-এর merit-ই বিবেচ্য হওয়া উচিত। আর প্রথমাবধি ভারতের এই রেকর্ড খুবই ভাল। পরমাণু চুল্লি নিঃসৃত বিকিরণকে কৃষি উৎপাদনে, ফসলের জিনগত কল্যাণমূলক পরিবর্তনে তাকে জীবাণুমুক্ত করার কাজে লাগিয়েছে ভারত সার্থক ভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-সহ। সারা বিশ্ব চমৎকৃত হয়েছে বিগত শতকের ষাটের দশক থেকেই পরমাণু গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত মানের ফসল উৎপাদনে, সংরক্ষণে, দুরারোগ্য ব্যক্তির চিকিৎসায় আইসোটোপ ব্যবহারে। উদ্ভাবিত যন্ত্র ভাবাট্রন আইএইএ-র ক্যান্সার রোগ নিরাময় কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভারতের অবদানে। বিশ্বের সামগ্রিক পানীয় জল সংকটের প্রেক্ষিতে জলের লবণ-মুক্তিকরণে পরমাণুচুল্লি নিঃসৃত বিপুল পরিমাণ তাপকে কাজে লাগানোর জন্য International Nuclear Desalination Advisory Group-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ভারত ১৯৯৯ সালে মুম্বইতে এবং ২০০৪ সালে চেন্নাইতে আইএইএ-র প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মশালা করেছে। ১৯৭৬ সাল থেকেই ভারত বহু (World Health Organistion)-র SSDL (Secondary Standered Dosimatry Laboratories)-র একটি অঙ্গ। জর্জিয়ান রিপাবলিকের অনুরোধে জর্জিয়ার আকাশে তেজস্ক্রিয়তা-দূষণ সম্পর্কে সমীক্ষা চালায় ভারত তার গামারে বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। কয়েকটি যন্ত্র ভারত জর্জিয়াকে প্রদানও করে। এই ভারতকে এন এস জি-তে সদস্য করতে চীনের আপত্তি, যে চীন আন্তর্জাতিক আদলতের রায়কে অগ্রাহ্য করে! যেখানে ফ্রান্স আমেরিকা রাশিয়া জার্মান-সহ এনএসজি সদস্য অধিকাংশ দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্তি চায় সেখানে এককভাবে চীন বাধা দেয় কী করে? সে বাধা মান্যতা পাচ্ছেই বা কেন? তবে কি ভারত উচ্চ পর্যায়ের কোনো গোপন নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেলিং-এর শিকার হলো? তাহলে কি ইউএস অ্যাডভাইজার Ashely-র হিসেবটাই সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হলো? —Operating India's eight unsafeguarded PHWR (pressurised Heavy Water Reactor) in such a regime would bequeth New Delhi with some 12,135 kg of weapon grade plntorium which is sufficent to prodve between 2023 – 2228 nuclear weapons. Over and above those already existing in the Indian Arsenal a gigantic nuclear Arsenal.

বিশাল ব্যয়বহুল এই EPR (European Pressented Reactor) -র সাফল্য পরীক্ষিত না হলেও ভারত তা নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে। চীনেও এই ধরনের চুল্লি তাইশান-১ এবং তাইশান-২-এর কাজ চলছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নাকি চৈনিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে লক্ষ্যে পৌঁছতে। লক্ষ্য ২০৫০ সাল নাগাদ মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ২৫ শতাংশ। আমেরিকাসহ পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলির হিসেব কি ভারত এন পি টি-তে সই করতে বাধ্য হবে? চীন তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভারতকে সমৃদ্ধ করবে? আবার ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা— যাদের কারিগরী সহায়তা নিচ্ছে ভারত, তারা কেউই 'চুল্লি নিরাপত্তা' নিয়ে কোনো কথাই দেয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তাদের ভয়াবহ পরমাণু চুল্লি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বরং ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি ও তত্ত্বাবধানের চুল্লিগুলিকে এ অবধি কোনো সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম ভাণ্ডার সব থেকে বেশি। বিশ্বভাণ্ডারের প্রায় ৩১ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়া বারবার বলে এসেছে চুল্লি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হলে তবেই সে ইউরেনিয়াম সরবরাহের চুক্তি করবে। এই ব্ল্যাকমেল্ড হওয়ার পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায় পরমাণু চুক্তি-১২৩ নিয়ে ভারতকে ভাবতে হবে। স্বনির্ভরতার জন্য বিকল্প পথের সন্ধান করতে হবে। এবং তাতে সাফল্য লাভ অলীক চিন্তা নয় যদি দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা ভাবে। এই উদাহরণ তো আছেই।

পরিশেষে এন এস জি-তে চীনের ভূমিকা নিয়ে কয়েকটি মতামত তুলে ধরছি, Asistant Secretory of State for international security and Non proliferation–Thomas Coustryma বলেছেন, ''The problem is that China has since announced other power plants that its intends to build in Pakisthan and this is not consistent with the rule of NSG...''

সেনেটর ববকরকার এবং রবার্ট মেন্ডেজের মতে চীনের পাকিস্তানকে পরমাণু সামগ্রী— প্রযুক্তি, পরিষেবা বা মিসাইল মেটিরিয়্যাল সরবরাহ করা পরিষ্কার ভাবে এন এস জি-র ঘোষিত নীতির বিরোধী কারণ তা পরমাণু অস্ত্র প্রসারকে বেআইনি ভাবে মদত জোগাচ্ছে। সেই কারণে চীনকে এন এস জি থেকে বহিষ্কার করা উচিত। চীনের বিরোধিতাই ভারতকে এনএসজি সদস্যপদ পেতে দিচ্ছে না আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রমুখ পরমাণু অস্ত্রধর দেশের সমর্থন সত্ত্বেও। এটা কীভাবে সম্ভব হচ্ছে? এই প্রশ্নটাই উঠে আসছে বার বার।

(লেখক অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ)

ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীদের রহস্যমৃত্যুর নেপথ্যে

সন্দীপ চক্রবর্তী

সালটা ১৯৬৬। সে বছর ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানচর্চার পুরোধাপুরুষ ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাবা বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। সুইটজ্যারল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালার মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক শিখরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ে বিমানটি। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে অভিশপ্ত বিমানটির একটি টুকরোও খুঁজে পাওয়া যায়নি। খোঁজ মেলেনি হতভাগ্য যাত্রীদের মৃতদেহগুলিরও। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি দুর্ঘটনা। রহস্যের কোনো নামগন্ধ নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে বিষয়টা তত সহজ নয়। দুর্ঘটনার কিছুদিন আগে ড. ভাবা ঘোষণা করেছিলেন, ভারত আর কয়েক বছরের মধ্যে তার অ্যাটমিক ডিভাইস বানিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ পরমাণু বিজ্ঞানচর্চায় সাবালকত্ব অর্জন করার পথে অনেকখানি এগিয়ে যাবে। পরমাণু বোমা বানাতেও হয়তো আর বেশি সময় লাগবে না। অনেকেই সেই সময় বিমান দুর্ঘটনার পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখেছিলেন। অভিযোগের আঙুল উঠেছিল মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-র দিকে। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মুখে দুঃখ প্রকাশ করলেও কোনো তদন্তের নির্দেশ দেননি। নিপুণ হাতে ধামাচাপা দিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল একটি জ্বলন্ত প্রশ্নচিহ্ন।

কিন্তু এ প্রশ্ন পরেও উঠেছে। কারণ ড. ভাবার মৃত্যুতেই শেষ হয়নি এই পর্ব। ২০০৯ থেকে ২০১৩ এই পাঁচ বছরে দশজন বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ রহস্যজনক ভাবে মারা গেছেন। হয় খুন হয়েছেন নয়তো কোনো অজ্ঞাত কারণে 'আত্মহত্যা' করেছেন। কয়েক বছর আগে সমাজসেবী চেতন কোঠারী তথ্য আইনে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন বম্বে হাইকোর্টে। তাঁর অভিযোগ ছিল ২০০৯ থেকে ২০১৩ এই পাঁচ বছরে একাধিক পরমাণু বিজ্ঞানীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ হয় রহস্যের কিনারা করতে না পেরে আগেভাগে ফাইল বন্ধ করে দিয়েছে, নয়তো 'আত্মহত্যা' বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। তাই অভিযোগকারী পক্ষের আইনজীবী একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন। যাতে দেশের মানুষ পরমাণু বিজ্ঞানীদের অদ্ভুত মৃত্যুর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। আজও ভারতবর্ষের মানুষ জানেন না দেশের প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যাঁরা যুক্ত তাঁদের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনে ভারত সরকারের এত অনীহা কেন! বর্তমান সরকার রহস্য উদ্ঘাটনের কিছু কিছু কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু পূর্বতন ইউপিএ সরকার কোনো উদ্যোগ নেননি। কাদের আড়াল করতে চেয়েছেন তারাই বলতে পারবেন। যাই হোক, এখন দেখা যাক কীভাবে মারা গেছেন ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীরা। কেনই বা তাদের মৃত্যুতে দানা বেঁধেছে রহস্য!

লোকনাথ মহালিঙ্গম :

২০০৯ সালের ১৩ জুন ভারতের সংবাদমাধ্যম বিজ্ঞানী লোকনাথ মহালিঙ্গমের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করল। প্রচারবিমুখ এই বিজ্ঞানী সাধারণ মানুষের কাছে তত পরিচিত মুখ ছিলেন না।

ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র

ভারতে পরমাণু বিজ্ঞানচর্চার প্রধানতম কেন্দ্র বলতে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রকেই বোঝায়। এর প্রতিষ্ঠা ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৪। তখন অবশ্য নাম ছিল অ্যাটমিক এনার্জি এসট্যাব্লিশমেন্ট, সংক্ষেপে এইইটি। ১৯৬৬ সালে হোমি জাহাঙ্গির ভাবার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর বর্তমান নাম রাখা হয়। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর তৈরি এবং তার মানোন্নয়ন করা এখানকার প্রধান কাজ। এছাড়া রয়েছে নানা ধরনের ধাতুবিদ্যার মৌলিক গবেষণা। এখানে তৈরি প্রথম রিঅ্যাক্টরের নাম অপ্সরা। নামটি দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। অপ্সরা ছাড়া রয়েছে সাইরাস (১৯৬০), জেরলিনা (১৯৬১), পূর্ণিমা (১৯৭২), পূর্ণিমা-২ (১৯৮৪), ধ্রুব (১৯৮৫), পূর্ণিমা-৩ (১৯৯০) এবং কামিনী। ১৯৭৪ সালে ভারত স্মাইলিং বুদ্ধ নামের যে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তার অপরিহার্য উপাদান প্লুটোনিয়ামের জোগান দিয়েছিল সাইরাস।

কর্ণাটকের কাইগা অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ করছিলেন। সেনাবাহিনীর কাছে কাইগা পাওয়ার স্টেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রোজেক্ট সিবার্ডের কাছেই এর অবস্থান। কাইগার আটটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের মধ্যে চারটিই মিলিটারি পরিভাষায় 'স্ট্র্যাটেজিক'। সেই সুবাদে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সির নিয়ন্ত্রণমুক্ত। আরও একটি কারণে কাইগার গুরুত্ব। ভারতীয় নৌ-ঘাঁটি আই এন এস কদম্বর চৌহদ্দির মধ্যেই এর অবস্থান।

২০০৯ সালের ৮ জুন ৪৭ বছর বয়েসি লোকনাথ মহালিঙ্গম প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তারপর আর ফেরেননি। পাঁচদিন পর তাঁর পচনধরা মৃতদেহ কালী নদীতে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, মৃতদেহ শুধু চাক্ষুষ করেই পুলিশ আত্মহত্যার তত্ত্ব খাড়া করে দেয়। কোনো সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। মৃতের পরিবারবর্গও আত্মহত্যার তত্ত্ব মানতে চাননি। তাঁরা ডিএনএ পরীক্ষার দাবি করেছিলেন। কিন্তু ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট— এমনকী পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট হাতে পাওয়ার আগেই পুলিশ দেহ সৎকার করে ফেলে। সন্দেহটা এখানেই। তাছাড়া, মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, যাঁরা আত্মহত্যা করেন তাঁরা সাধারণত দ্রুত মৃত্যু হবে এমন কোনো উপায় খুঁজে নেন। কিন্তু মহালিঙ্গমের মৃত্যু অনেক সময় নিয়ে হয়েছিল। তাই প্রশ্ন উঠেছে, তাঁকে কি খুন করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল? রহস্য আরও আছে। পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সেদিন তিনি অন্যদিনের মতো সঙ্গে টাকাপয়সা এবং মোবাইল ফোন নিয়ে যাননি। সেসব তাঁর বাড়িতেই পাওয়া গেছে। এবং সেদিনের ডিউটিতে থাকা নিরাপত্তারক্ষী তাঁকে ক্যাম্পাস থেকে বেরোতে দেখেননি। তা হলে? এই 'তাহলে'র উত্তর স্পষ্ট করে কেউ দেননি। তার বদলে দিয়েছেন আর এক রহস্যের সন্ধান। কর্ণাটক পুলিশের দেওয়া সূত্র অনুযায়ী, দশ বছর আগে মহালিঙ্গমের জীবনে এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল। সেবার তিনি কোনোভাবে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন। তখন তিনি কলাপক্কম পাওয়ার স্টেশনে কর্মরত। এই পাওয়ার স্টেশনটিও দুটি স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে সমৃদ্ধ। সেবার মহালিঙ্গম একদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। ফিরে আসেন পাঁচ দিন পর। কিন্তু কলাপক্কম পাওয়ার স্টেশনের কর্তৃপক্ষ কিংবা ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কেউই তাকে প্রশ্ন করেনি এই পাঁচদিন তিনি কোথায় ছিলেন। তিনিও কোনো উত্তর দেননি। আরও একটি পিলে চমকে দেবার মতো খবর, মহালিঙ্গমের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গেছে ঠিক সেইখানে, বছর পাঁচেক আগে কয়েকজন অত্যাধুনিক অস্ত্রধারী দুষ্কৃতী নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনের এক আধিকারিককে অপহরণের চেষ্টা করেছিল। তিনিও কোনোরকমে প্রাণে বাঁচেন। কাইগা পাওয়ার স্টেশন ভারতের

হোমি জাহাঙ্গির ভাবা

লোকনাথ মহালিঙ্গম

উমা রাও

ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। লোকনাথ মহালিঙ্গম ছিলেন ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণায় দক্ষ বিজ্ঞানী। হতে পারে, কোনো ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশী দেশ তাঁকে হত্যা করিয়েছে। অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অথচ প্রশাসন আত্মহত্যার তত্ত্ব আউড়েই খালাস। একইরকম ঘটনা ঘটেছে আরও কয়েকজনের ক্ষেত্রে।

উমা রাও :

ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী তেষট্টি বছরের উমা নরসিংহ রাও তাঁর গোবাণ্ডির বাড়িতে আত্মহত্যা করেন ২০১১-র এপ্রিল মাসে। যে সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছিল তাতে তিনি লিখেছেন, 'তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' সুইসাইড নোট পাওয়া মাত্র পুলিশ 'মানসিক অবসাদে'র তত্ত্ব খাড়া করে দেয়। এক্ষেত্রেও মৃতার নিকট পরিজনেরা পুলিশের তত্ত্ব মানেননি। তাঁদের প্রশ্ন, উমার মতো সদা হাস্যময় সফল বিজ্ঞানী কেন মানসিক অবসাদে ভুগবেন! তাছাড়া, তাঁর যদি কোনো মানসিক কষ্ট থাকত তাহলে কি তাঁর বাড়ির লোকেরা জানতে পারতেন না? চিকিৎসার কোনো প্রমাণও পুলিশ দিতে পারেনি। কিন্তু তাতে কী! প্রশ্ন যতই উঠুক উত্তর দেবার দায় কারও নেই। কিছুদিন লোকদেখানো তদন্ত করে কেসফাইলে 'অমীমাংসিত' তকমা সেঁটে পুলিশ কর্তব্য সেরেছে।

রবি মুলে :

রবি মুলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন ইন্ডিয়া লিমিটেডের বিজ্ঞানী। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। কিছুদিন পর তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। পুলিশ যথারীতি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রবি মুলের ভাই একক প্রচেষ্টায় তদন্ত করে জানতে পারেন তাঁর দাদাকে খুন করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত পুলিশও মেনে নেয়। তবে ওই পর্যন্তই। হত্যারহস্যের কোনো সমাধান আজ অবধি হয়নি।

এম আয়ার :

এম আয়ার ছিলেন ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের প্রযুক্তিবিদ। ২০১০-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি নিজের বাড়িতে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক মৃত্যু। কারণ তাঁর মাথার খুলির পিছনে ভারী কোনো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের স্পষ্ট প্রমাণ ছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও 'মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণই মৃত্যুর কারণ' বলে জানানো হয়েছিল। অথচ পুলিশ বেমালুম বলে দিল, এমন কোনো আঙুলের ছাপ বা ক্ল্যু তারা পায়নি যার ভিত্তিতে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা যায়। পুলিশের একাংশের বক্তব্য, বিজ্ঞানীদের মৃত্যু যদি আত্মহত্যা বলে চালানো না যায় তাহলে সাধারণত কেসফাইলে 'অমীমাংসিত' লেবেল সেঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যাই হোক, এই কেসে এখনও পর্যন্ত কেউ

গ্রেপ্তার হয়নি। ফাইলও বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু জন্ম দিয়েছে বিতর্কের। আজ অবধি যতজন বিজ্ঞানী খুন হয়েছেন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হত্যাকারী কোনো প্রমাণ রাখেনি। আঙুলের ছাপ পর্যন্ত নেই। এর থেকে বোঝা যায় হত্যাকারীরা কতটা পেশাদার! উল্লেখ্য, ইরানেও সাম্প্রতিক অতীতে কয়েকজন পরমাণু বিজ্ঞানী খুন হয়েছেন। প্রমাণের অভাবে সেইসব হত্যাকাণ্ডেরও কোনো মীমাংসা হয়নি। প্রশ্ন হলো এরা কারা? কাদের অঙ্গুলিহেলনে এরা দেশে-দেশে বিজ্ঞানীদের হত্যা করছে? আর কেনই বা করছে?

কে. কে. যোশী এবং অভীশ শিবম :

কে. কে. যোশী এবং অভীশ শিবম পেশায় পরমাণু প্রযুক্তিবিদ। দু'জনেই কাজ করছিলেন পরমাণু শক্তি-চালিত একটি সাবমেরিন প্রকল্পে। ২০১০-এর এক সকালে রেলকর্মীরা রেললাইনের ওপর দু'জনের মৃতদেহ দেখতে পান। না, রেলে কাটা পড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়নি। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁদের বিষ খাইয়ে অন্য কোথাও হত্যা করে মৃতদেহ দুটি রেললাইনে ফেলে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। উদ্দেশ্য, হত্যাকে আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনার রূপ দেওয়া। দুই প্রযুক্তিবিদই ছিলেন স্বক্ষেত্রে দক্ষ। বস্তুত তাঁদের অকালমৃত্যু সাবমেরিন প্রকল্পের কাজে যথেষ্টই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অন্য কোনো দেশ হলে দুই পরমাণু প্রযুক্তিবিদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সংবাদমাধ্যমে ঝড় বয়ে যেত কিন্তু ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ঘটনাটিকে সাধারণ দুর্ঘটনার বেশি মর্যাদা দেয়নি। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ভূমিকাও ছিল তথৈবচ! একজন সাধারণ এ. এস. আই-কে দিয়ে তদন্ত করানো হয়। শেষ পর্যন্ত সম্ভবত সিনিয়রদের নির্দেশেই তিনি ফাইল বন্ধ করে দেন।

উমঙ্গ সিংহ এবং পার্থপ্রতিম বাগ :

তরুণ গবেষক উমঙ্গ সিংহ এবং পার্থপ্রতিম বাগ ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের রেডিয়েশন ও ফোটোকেমিস্ট্রি বিভাগের ল্যাবে রহস্যজনকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। রহস্যজনক কারণ পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী ল্যাবে এমন কিছু ছিল না যা থেকে আগুন লাগতে পারে। তাছাড়া, ল্যাবে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তা সময়মতো কাজ করল না কেন? অ্যালার্মের তারই বা কেন কাটা ছিল? এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পুলিশ দিতে পারেনি। প্রশাসনও নীরব। বস্তুত উমঙ্গ এবং পার্থপ্রতিমের পরিবারের লোকেরা এখনও জানেন না ঠিক কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল!

ডালিয়া নায়েক

পার্থপ্রতিম বাগ

উমঙ্গ সিংহ

মহম্মদ মুস্তাফা :

চব্বিশ বছরের মহম্মদ মুস্তাফা ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চের বিজ্ঞানী। যার হেডকোয়ার্টার কলাপক্কমে। ২০১২ সালে পুলিশ মহম্মদ মুস্তাফার কোয়ার্টার থেকেই তার কবজির শিরাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার করে। সুইসাইড নোট মিললেও পুলিশ আত্মহত্যার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি।

তিতাস পাল :

ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের ২৭ বছর বয়সি বিজ্ঞানী তিতাস ২০১২ সালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার তত্ত্ব এক্ষেত্রেও পুলিশের এবং যথারীতি যথেষ্ট সন্দেহজনক। কারণ তিতাসের বাবা সুব্রত পাল জানিয়েছেন, মারা যাওয়ার তিন দিন আগে তিতাস বাবা-মার সঙ্গে কলকাতায় তাঁর জন্মদিন কাটিয়েছিলেন। দিব্যি হাসিখুশি তিতাসকে দেখে কারও কোনো সন্দেহ হয়নি। ৩ মার্চ কাজে যোগ দেন। সেই দিনই সন্ধ্যেয় তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। কোনো সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।

ডালিয়া নায়েক :

ডালিয়া ছিলেন সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের রসায়ন বিভাগের গবেষক ও অধ্যাপক। অভিযোগ, মাত্রাতিরিক্ত মারকিউরিক ক্লোরাইড খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশী-বন্ধুরা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার, কলকাতা পুলিশও ডালিয়ার মৃত্যুকে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নারাজ। তাঁরা মানসিক অবসাদের যুক্তি দেখিয়েছেন। যদিও বন্ধু এবং সহকর্মীরা জানিয়েছেন, ডালিয়া অসম্ভব মজা করতে ভালোবাসতেন। মানসিক অবসাদের কোনো লক্ষণ তাঁরা তাঁর মধ্যে দেখেননি। আরও একটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ। মূলত রসায়নের গবেষক হলেও মারা যাবার কয়েক বছর আগে থেকে তিনি তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। যাঁদের কথা আলোচিত হলো তাঁরা ছাড়াও তালিকায় রয়েছেন অবদেশ চন্দ্র, আশুতোষ শর্মা, সৌমিক চৌধুরি, অক্ষয় চ্যবন, সুভাষ সোনওয়ানে, যশওয়ান্ত রাও এবং তিরুমালা প্রসাদ টেঙ্কার নাম। এরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী এবং প্রত্যেকেই রহস্যজনক ভাবে আত্মহত্যা করেছেন। জি. কে. কুমারভেল গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এতজন বিজ্ঞানীর মৃত্যু সবসময়েই সন্দেহজনক। তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ যখনই পরমাণু গবেষণায় স্বাবলম্বী হবার কথা ভেবেছে তখনই ধেয়ে এসেছে গুপ্তঘাতকের দল। ইন্ধন জুগিয়েছে প্রথম বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি। এর অজস্র প্রমাণ বিশ্বের ইতিহাসে আছে। ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীদের অপমৃত্যুর পিছনেও যদি তাদের হাত থাকে তা হলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু অবাক হতে হয় ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের হিমশীতল নিস্পৃহতায়। এতদিন তাঁরা কাকে আড়াল করেছেন? কীসের স্বার্থে? ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে কোন সাহসে ছিনিমিনি খেলেছেন? আজ হোক বা কাল মানুষ কিন্তু এ প্রশ্ন তুলবেন। ভূতপূর্ব কর্ণধাররা জবাব দেবার জন্য তৈরি তো? ■

পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের শিকার কুলভূষণ যাদব

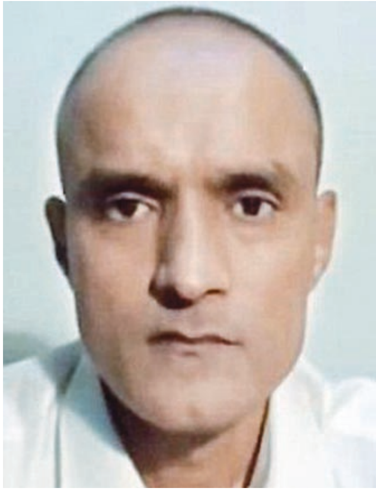

দীপ চক্রবর্তী ॥ কুলভূষণ যাদব সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানি মিডিয়ায় যা বেরিয়েছে তার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় সে দেশের সেনাবাহিনী এমন একটি নিটোল চিত্রনাট্য অনুসরণ করছে যার প্রণেতা তাদের সেনাপ্রধান স্বয়ং। কুলভূষণ যাদব একজন ভারতীয় নাগরিক। গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে পাকিস্তানের সেনা আদালত তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে। কিন্তু আদালতের রায় ঘোষণার অনেক আগেই কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল জাভেদ বাজওয়ার মন্তব্যটি তার প্রমাণ। সেদিন তিনি ভারতের বিরুদ্ধে 'শয়তানি কার্যকলাপ' এবং 'সন্ত্রাসবাদে ইন্ধন জোগানোর' অভিযোগ করে বলেন, 'ভারতের গুপ্তচর কুলভূষণ যাদবই তার সবথেকে বড়ো প্রমাণ। আমরা এই সমস্যার যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান খুঁজে বের করব।'

প্রশ্ন হলো, আদালতে শুনানি শুরু হবার আগেই জেনারেল বাজওয়া কীভাবে জানতে পারলেন যে কুলভূষণ যাদব একজন গুপ্তচর? এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ড আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। জেনারেল বাজওয়ার আর একটি বিবৃতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'একদিকে ভারত কাশ্মীরে তাদের ভয়ানক দমনপীড়নের ওপর যাতে বিশ্বের নজর না পড়ে তার জন্য মাঝে মাঝেই যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করছে। অন্যদিকে, সন্ত্রাস বন্ধে পাকিস্তানের লাগাতার চেষ্টাকেও বিশ্বব্যাপী লঘু করে দেখাচ্ছে।' এর থেকে স্পষ্ট কুলভূষণ যাদবের জীবনে যে দুঃখময় অধ্যায় শুরু হয়েছে তা আসলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে পর্যুদস্ত বালুচিস্তানে ভারতের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ। জেনারেল বাজওয়া সারা বিশ্বকে দেখাতে চান, ভারতের জন্য বালুচিস্তানে অশান্তির আগুন জ্বলছে। কুলভূষণ যাদবকে বলির পাঁঠা বানানো হলো সেই কারণেই।

৩ মার্চ ২০১৬, কুলভূষণ যাদবকে গ্রেপ্তার করার পর পাকিস্তান অভিযোগ করেছিল যে তিনি ভারতের তদন্তকারী সংস্থা র-এর (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং) একজন গুপ্তচর। বালুচিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে তার ভূমিকা রয়েছে। বালুচিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরফরাজ বাগতির অভিযোগ ছিল, কুলভূষণ সন্ত্রাসবাদীদের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। মোবাইল ফোনে মারাঠিতে কথা বলার সময় তিনি ধরা পড়েন। কিন্তু পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত কুলভূষণের গুপ্তচরবৃত্তির স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। সম্ভবত পারবেও না। তবে সে প্রসঙ্গে যাবার আগে কুলভূষণের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে কিছু কথা বলা যেতে পারে।

১৯৮৭ সালে কুলভূষণ ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন। ভারতীয় নৌসেনায় যোগ দেন ১৯৯১ সালে। যে ভিডিয়ো 'প্রমাণ' পাকিস্তান প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কুলভূষণ নিজেকে র-এর গুপ্তচর হিসেবে স্বীকার করেছেন। তাঁকে এও বলতে শোনা গেছে ২০০১ সালে সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলা হওয়া পর্যন্ত তিনি নৌসেনাতেই ছিলেন। এরপর তিনি নাম বদল করে (হুসেন মুবারক প্যাটেল) ভারতেই প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এর কিছুদিন পরই তিনি নৌসেনার চাকরি ছেড়ে দেন। ব্যবসা শুরু করেন। এই সময় কয়েকবার ব্যবসার কাজে বিদেশেও গেছেন। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, কুলভূষণ সবসময় প্রাক্তন সৈনিক হিসেবে তাঁর পরিচয়পত্রটি নিজের কাছে রাখতেন। পরিবারের আশঙ্কা, এই কারণেই তাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে। কুলভূষণ থাকতেন মুম্বই-এর হীরানন্দানী গার্ডেন অঞ্চলে। আবাসনটি পুলিশ অফিসারদের থাকার জন্য। কুলভূষণের বাবা সুধীর যাদব মুম্বই-এর প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। অবসর নিয়েছেন ৯ বছর আগে। কুলভূষণের কাকা সুভাষ যাদব বান্দ্রা থানার

দায়িত্বে ছিলেন ২০০২ সালে। কুলভূষণ বিবাহিত। দুটি সন্তানও আছে।

যে ভিডিওটি পাকিস্তান 'প্রমাণ' হিসেবে দাখিল করেছে সেটি যে জাল তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। গোয়েন্দাদের সন্দেহ, আলকায়দার সহযোগী সংগঠন জয়শুল আদিল কুলভূষণকে অপহরণ করে থাকতে পারে। তারপর তাকে অর্থের বিনিময়ে সেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সন্দেহ প্রকাশ করেছে বিদেশমন্ত্রকও। এক আধিকারিক বলেন, 'ভিডিওতে প্রদর্শিত ব্যক্তির কথাবার্তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। দেখলেই বোঝা যায় শিখিয়ে পড়িয়ে ক্যামেরার সামনে আনা হয়েছে।'

এখানেই স্পষ্ট হয়ে গেছে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা। জেনারেল বাজওয়া এই সেদিনও বলেছেন, 'ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মানুষকে আমরা সাহায্য করে যাব।' এর দু'দিন পরেই উঠে এল র-এর মদতপুষ্ট তথাকথিত তিনজন 'ভারতীয় গুপ্তচরের' প্রসঙ্গ। মোদ্দা কথা, ভারতের তদন্তকারী এজেন্সিগুলো শুধু বালুচিস্তানেই নয়, 'আজাদ কাশ্মীরে'ও ঝামেলা করছে। তাই, 'আমরা দেখে নেব।' তখন আদালত-টাদালত কোথায়! আদালত নামক ধোঁকার টাটি খাড়া করা হলো শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক দুনিয়ার মুখ বন্ধ করার জন্য।

আরও একবার প্রমাণিত হলো ইসলামি দেশগুলি মধ্যযুগেই পড়ে আছে। যেখানে আজও রাজনৈতিক প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য মুণ্ডু কেটে ফেলে কাজির বিচারের সাফাই গাওয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে জেনারেল বাজওয়ার কেরিয়ার এখন ঘোর সঙ্কটের সম্মুখীন। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে তাঁরও নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আছে। নয়তো থেকে যেতে হবে পূর্বসূরি রহিল শরিফের ছায়ায়। ইসলামি দুনিয়ায় শরিফকে মসিহা হিসেবে দেখা হয়। জেনারেল বাজওয়াকেও মসিহা হতে হবে। তাই তিনি কুলভূষণের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছেন। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের কিছু করার নেই। যতবার পাকিস্তানে নতুন সেনাপ্রধান দায়িত্ব নিয়েছেন ততবারই তাদের অপরিণামদর্শিতার ফল তাকে ভুগতে হয়েছে। কুলভূষণের যদি ফাঁসি হয়ে যায় তা হলে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় তারই মাথা হেঁট হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। পাকিস্তানে এই নিয়মই চলবে।

এই প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেব সর্বজিৎ সিংহের কথা। পঞ্জাবের কৃষক পরিবারের সন্তান সর্বজিৎ ভুল করে পাকিস্তানে ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ১৯৯১ সালে লাহোর এবং ফয়জলাবাদের বোমাবিস্ফোরণে যুক্ত ছিলেন। যদিও কেউ কেউ বলেন প্রথমে তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পরে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনা হয়। ওই বছরেই সর্বজিতের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয় আদালত। যদিও পুনর্বিচারের আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। কিন্তু সর্বজিতের পাকিস্তানি আইনজীবী শুনানির দিন ইচ্ছে করে আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় একতরফা ডিক্রি জারি হয়ে যায়। এই মামলার অন্যতম প্রধান সাক্ষী শওকত সেলিম বলেছিলেন, তিনি সর্বজিতকে বিস্ফোরণ ঘটাতে দেখেছেন। কিন্তু কিছুদিন পর সংবাদমাধ্যমকে জানান পুলিশের ভয়ে সেদিন তিনি মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য

ভারতের নাগরিক কুলভূষণ যাদবকে যেভাবে মিথ্যা অভিযোগে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানী সেনা আদালত মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে, তা যদি কার্যকর হয় তবে পাকিস্তানকে এর মূল্য দিতে হবে।

হয়েছিলেন। সর্বজিতের মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। না, তাকে ফাঁসি দেবার দরকার পড়েনি। ২০১৩-র ২৩ এপ্রিল লাহোর সেন্ট্রাল জেলের কয়েকজন দাগি কয়েদি লোহার রড, খোলা তলোয়ার নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুদিন আগেই ভারতে আফজল গুরুর ফাঁসি হয়েছে। সর্বজিতের ওপর হামলা ছিল তার প্রতিশোধ। গুরুতর আহত অবস্থায় সর্বজিতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভারত সরকার মানবিক কারণে সর্বজিতকে মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল। মানা হয়নি। শেষে বলেছিল চিকিৎসার জন্য সর্বজিতকে নিজের দেশে অন্তত একটিবারের জন্য আসতে দেওয়া হোক। তাও মানা হয়নি। চাষির ছেলে দেশের সবুজ থেকে অনেক দূরে রুক্ষ হৃদয়হীন শহরে নিষ্ফল অভিমানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। শেষ সময়ে কাছে ছিলেন বোন, স্ত্রী-সহ অন্যান্য আত্মীয় পরিজনেরা।

সুতরাং এই হলো পাকিস্তান। চিরকালীন বর্বরতার একটি চেনা নাম। ভারত চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ কুলভূষণকে 'দেশ কা বেটা' বলে সম্বোধন করেছেন। সত্যিই তাই। যে করেই হোক দেশের সন্তানকে আবার দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর একজন 'সর্বজিত' কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না। এই ব্যাপারে সারা পৃথিবী ভারতের পাশে। এত মানুষের আন্তরিক প্রার্থনা কখনওই ব্যর্থ হবে না।

এই সময়

কাগজে কালাম

কোয়েম্বাটোরের কমফোর্ড আন্তর্জাতিক স্কুলের ১৬৭ জন ছাত্র কাগজের কাপ দিয়ে

তৈরি করেছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের মোজাইক। লক্ষ্য, গিনিস বুক অব রেকর্ডস। ওরা জানিয়েছে এই মোজাইক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধার স্মারক।

দানবশৈল

যে হিমশৈলের ধাক্কায় টাইটানিকের ভরাডুবি হয়েছিল, ইনি সাইজে তার দ্বিগুণ।

সম্প্রতি দেখা দিয়েছেন কানাডার উপকূলবর্তী শহর নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রেডরে। এমনিতে অকুলীন শহরদুটি দৈত্যের আগমনে জাতে উঠেছে।

রাশিয়ায় কত্থক

রাশিয়ার মেয়ে শ্বেতলানা তুলাগি রীতিমতো নাড়া বেঁধে কত্থক শিখেছিল।

তারপর দেশে ফিরে একটি রিয়ালিটি শো-তে প্রথম অনুষ্ঠান। দেখে তো সবাই থ। এমন অবস্থা, শ্বেৎলানার নাম থাকলেই যে কোনো অনুষ্ঠানের টি আর পি বেড়ে যাচ্ছে।

নববর্ষে সংস্কার ভারতীর দেওয়াল পঞ্জীর প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় আকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সাংস্কৃতিক দেওয়াল পঞ্জীর লোকার্পণ করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী সুনন্দা মুখোপাধ্যায়। ভগিনী নিবেদিতার জন্মসার্ধশত বছরে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ দেওয়াল পঞ্জীর বিষয় 'মহীয়সী ভারতীয় নারী'। দেওয়াল পঞ্জীর প্রতিটি পৃষ্ঠায় নিবেদিতার ভারতবর্ষ সম্পর্কিত একটি করে বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে। সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় দেওয়াল পঞ্জীর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন— ভারতের মহীয়সী নারীদের মধ্যে যাঁরা আজ বিস্মৃত প্রায় তাঁদেরকেই বিশেষ ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। বৈদিক যুগের গার্গী, লোপামুদ্রা থেকে শুরু করে সমগ্র ভারতের পূর্বোত্তর, কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারত-সহ বিভিন্ন প্রান্তের মহীয়সী নারী হিসাবে প্রাচীন সাহিত্যের নারী চরিত্র, বীরাঙ্গনা রমণী, দিব্যানুভূতি সম্পন্না নারী, দানশীলা রমণী, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী, ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্তা রমণীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সুনন্দা মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন— পরিশ্রম সাপেক্ষ, প্রামাণ্য এই দেওয়াল পঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি আনন্দিত। নববর্ষ আবাহন সন্ধ্যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রয়াতা লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য রচিত 'অলীকসুখ' উপন্যাস

অবলম্বনে নাটক। নাটকের মূল উপজীব্য ছিল ব্যক্তিগত সুখ ও চিকিৎসকের সামাজিক এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার সংঘাত। নাটকের শেষে দ্বিতীয়টিরই জয় হয়। সংস্কার ভারতীর নাট্য বিভাগের কলাকুশলীরাই এই নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা ছিল প্রান্তের অন্যতম প্রবীণ উপদেষ্টা বিকাশ ভট্টাচার্যের। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী ও বাংলার বিপ্লবী বিষয়ক গবেষক এবং রানী বিড়লা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রয়াত ড. মণিদীপ চট্টোপাধ্যায়

গত ৫ এপ্রিল সকালে বাংলার অগ্রগণ্য স্থপতিবিদ অধ্যাপক মণিদীপ চট্টোপাধ্যায় ৭৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘকাল যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় স্ত্রী ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। নগর পরিকল্পনায় তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী গবেষক ও পরামর্শদাতা। ১৯৬৬ সালে কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং সংস্থার (সিএমপিও) রূপরেখা প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। ১৯৭৬ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় পূর্ব কলকাতা নগরায়ন প্রকল্পের চালচিত্র নির্মাণের তিনি ছিলেন মুখ্য কারিগর। এরপর চার দশক অতিক্রান্ত, পূর্ব কলকাতার নগরায়ন তখন বিশালাকায় অবয়ব ধারণ করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরা মণিদীপবাবুর মতো নিরলস প্রাজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের কথা মনে রাখেননি? তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী। ভারত বিকাশ পরিষদের বিধাননগর শাখার প্রাক্তন সভাপতি। কলকাতার নগর পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ ও নিবন্ধ রয়েছে। প্রয়াত মণিদীপবাবুর বিদেহী আত্মার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

সাহায্যের হাত

এরকমটা সত্যিই দেখা যায় না। চার সন্তানকে নিয়ে এক মহিলা বিমানে উঠেছিলেন। দুটি একেবারে দুধের শিশু। দুধ খাওয়াতে হিমসিম খাচ্ছিলেন মহিলা। এগিয়ে এলেন পাইলট টম নাইস্ট্রম। শিশুর মুখে ধরলেন দুধের বোতল। দিব্যি খেল। অবোধ চাউনিতে ধন্যবাদও দিল বন্ধুকে।

বিশ্ব পরম্পরা দিবস

১৮ এপ্রিল ছিল বিশ্ব পরম্পরা দিবস। সারা বিশ্বে ইউনেসকো- স্বীকৃত ১০০০ স্থান

রয়েছে যা বিশ্ব পরম্পরার অন্তর্গত। এর মধ্যে ভারতে রয়েছে ৩৫টি। এর কিছু মানুষের তৈরি, কিছু প্রাকৃতিক। ইউনেসকোর নির্দেশ, এইসব স্থান এবং স্মারকের রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিটি দেশকে আরও যত্ন নিতে হবে।

নারদ জয়ন্তী

ভারতে সাংবাদিকতার আদিপুরুষ মানা হয় দেবর্ষি নারদকে। পুরাণমতে, দেব, মর্ত্য এবং পাতাললোকে নারদই সংবাদ আদানপ্রদান করতেন। নারদজয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মহাজাতি সদনে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছে। অংশ নেবেন সাংবাদিকতার পড়ুয়ারা।

জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের আলোচনা সভা

গত ১৯ মার্চ, জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ সায়েন্স সিটি সেমিনার হলে ইউজিসি প্রণীত নতুন CBCS (Choice based credit system) শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনদয়াল কলেজের অধ্যাপক অনুরাগ মিশ্র প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এই পদ্ধতি মূলত ছাত্রকেন্দ্রিক।

ছাত্ররা নিজেদের সুবিধা এবং মেধা অনুযায়ী বিষয় বেছে নিতে পারবে। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে পারবে যাতে কোনো কারণেই তাদের শিক্ষায় বাধা না পড়ে। মূল বিষয়ের সঙ্গে নৈতিক পাঠও হবে। W.B. University of Animal and Fishery Sciences-এর অধ্যাপক রমণ ত্রিবেদী পশ্চিমবঙ্গে এ নিয়ে কতদূর কাজ হয়েছে আলোচনা করেন। তাছাড়া, 7th Pay Commission-এ ABRSM কী বক্তব্য পেশ করেছে তা জানালেন। ৩ ঘণ্টা ধরে আলোচনাচক্র চলে। শেষে দুই বক্তাকেই ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

শ্রদ্ধা'র ৮৫ তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৯ মার্চ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিশির কুমার চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার পক্ষে ৮৫তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় তাঁর বাসগৃহে। তিনবার 'ওঁ' ধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রদ্ধার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের হস্তপদ ধুইয়ে পূজা করেন তাঁর ছোট বৌমা শ্রীমতী পাপিয়া চট্টোপাধ্যায়। শ্রী চট্টোপাধ্যায়কে গীতা, বস্ত্র, নামাবলী, মিষ্টান্ন, ফলের ডালা অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন কুবীলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক সুব্রত সিনহা। মানপত্র পাঠ ও প্রদান করেন লাউজোড় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জীবন মুখোপাধ্যায়। আরতি করেন শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্র ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়। সিউড়ির প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুধীর ভাণ্ডারী শিশিরবাবুর প্রশংসা ও নীরোগ শরীর কামনা করে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে উপস্থিত সকলে শ্রী চট্টোপাধ্যায়কে ফুল দিয়ে প্রণাম নিবেদন করেন। পূর্বসৈনিক ও শ্রদ্ধার সহ-সম্পাদক জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

এই সময়

পঞ্চায়েত রাজ

সদ্যই মহাধুমধামের সঙ্গে পালিত হলো পঞ্চায়েতরাজ দিবস। এই উপলক্ষে বিভাগীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর জানিয়েছেন, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্র আগামী পাঁচ বছরে গ্রামীণ উন্নয়নের দু' লক্ষ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

নাগাল্যান্ড শীর্ষে

ইন্টারনেট ব্যবহারের নিরিখে সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলে নাগাল্যান্ড শীর্ষস্থান

অধিকার করেছে। ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া এবং নিয়েলসেনের উদ্যোগে যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতেই মিলেছে এই তথ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে মণিপুর এবং ত্রিপুরা।

কোহিনূরে না

সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে কোহিনূর দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ জারি করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি জে. এস. কেহরের নেতৃত্বাধীন যৌথ

বেঞ্চ এই মন্তব্য করেছে। তাঁদের যুক্তি বিষয়টি বিদেশি রাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত। তাই আদালত নাচার।

সমাবেশ -সমাচার

তাজপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৪ এপ্রিল, সরস্বতী শিশু মন্দির, তাজপুর বাঁকুড়ার বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী ভগবতী প্রসাদ জালান, চেয়ারম্যান শঙ্কর নেত্রালয়, কলকাতা। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। শ্রী জালান প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। দীপবন্দনা ও মাতৃবন্দনার মধ্য দিয়ে শিশু ভাইবোনেরা মা সরস্বতীর বন্দনা করেন। উপস্থিত অতিথিদের নৃত্যের মাধ্যমে শিশু বোনেরা স্বাগত জানায়। শিশুরা ছড়া, আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, ব্যায়াম, আসন ও গোপুরম প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মাত্রাকে আরো হৃদয়ঙ্গম করে তোলেন। সবশেষে শিশু ভাইবোনদের পরিবেশিত নাটিকা 'স্বচ্ছভারত সুস্থভারত' সমাজের কাছে এক অমোঘ দিশা সৃষ্টি করে।

শোকসংবাদ

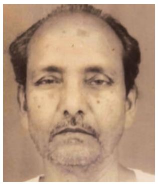

মালদহ জেলার গাজোল থানার চিৎকুল গ্রামের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ভক্তিভূষণ মণ্ডল গত ১১ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। গাজোলে সঙ্ঘকাজ বিস্তারে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর সম্পূর্ণ পরিবার সঙ্ঘময়। তাঁরই এক ভাই স্বয়ংসেবক গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল মালদহ ইংরেজ বাজার পৌরসভার ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন। ভক্তিভূষণ মণ্ডলের তৎপরতায় চিৎকুল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ শিক্ষা নিকেতন যা জুনিয়ার হাইস্কুল থেকে আজ হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে। এই স্কুলের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এই কাজে তাঁর প্রেরণাদাতা ছিলেন প্রয়াত বংশীলাল সোনী এবং প্রয়াত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি ৪ ভাই, ২ কন্যা, ২ পুত্র-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

সিউড়ীতে শ্রীশ্রী ত্রিশূল উৎসব

গত ২৪, ২৫, ২৬ মার্চ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সিউড়ী শাখার ৫৮তম বার্ষিক শ্রীশ্রী ত্রিশূল উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় আচার্য বরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজী মহারাজ। পরে সংস্কার ভারতী সিউড়ী শাখা কর্তৃক নৃত্যনাট্য— 'রবির আলোয় নির্বাণ (তথাগত প্রণতি)' পরিবেশিত হয়। ২৫ মার্চ শ্রীশ্রী গুরুপূজারতি ও ভজন কীর্তনের পর এক বিরাট ধর্মীয় শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে আশ্রমে ফেরে। বিকালে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরীর হাতে কাপড় ও কম্বল বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলনে সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী শাশ্বতানন্দজী মহারাজ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হা। শ্রীশ্রী গুরুপূজারতির পর বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী 'মানব পুতুল' কর্তৃক 'নাটক' বেহুলা লখীন্দর পরিবেশিত হয়। ২৬ মার্চ সকালে ভজন কীর্তন এরপর বৈদিক শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। পরে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের মহাভিষেক, শ্রীশ্রী অন্নকূট ভোগ ও বীরভাবোদ্দীপক শ্রীশ্রী গুরুপূজারতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে রাঙামাটি বাউল সম্প্রদায় কর্তৃক বাউল গান পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে বিশ্বমৈত্রী স্থাপনে স্বামী প্রণবানন্দজীর অবদান বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ স্বামী শাশ্বতানন্দজী মহারাজ, সঙ্ঘের জামশেদপুর শাখার অধ্যক্ষ স্বামী শুভ্রানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী গুরুপদানন্দজী মহারাজ, ড. কিশোরী রঞ্জন দাস ও অধ্যাপক তিলক ভট্টাচার্য। শ্রীশ্রী গুরুপূজা আরতির পর অধ্যাপিকা শান্তা দাসের কণ্ঠে কীর্তন গান পরিবেশিত হয়।

হায়! ইভিএম-কে ফাঁসিয়ে দেওয়ার মজাদার খেলাটা আর উপভোগ করা যাবে না

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

হেরে যাওয়ার পর পরাজিত প্রার্থী বা দলে ভোট যন্ত্রে কারচুপি হয়েছে বলে দোষ চাপানো আমাদের দেশে একটি সময়োচিত ফ্যাশন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেই ১৯৮২ সালে নির্বাচন কমিশন যখন প্রথম কেরলের বিধানসভা নির্বাচনে এই ইভিএম-এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করে তখনও এর বিরোধিতা করে সোরগোল পড়েছিল।

মনে পড়ে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আগেই সিপিআই দলের সিভন পিল্লাই ইভিএম ব্যবহারকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু কেরল উচ্চ আদালত তাঁর দাবিকে পাত্তা দেয়নি। মজাটা এরপর থেকেই শুরু হলো। ইভিএম বন্ধ করার ফরিয়াদি পিল্লাই ওই ইভিএম যন্ত্রের ভোট গণনাতেই বিজয়ী হয়েছিলেন।

যথারীতি এর পর ছিল কংগ্রেস দলের পালা। তারা পিল্লাইয়ের নির্বাচনকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানায়। আর সেই থেকেই এই প্রথাটি ভারতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইভিএম মেশিনের একটি চিরাচরিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে পরাজিত পক্ষের ন্যায্য অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো। আসলে এই কেরল নির্বাচনের পর থেকেই যে কোনো আত্মসম্মান বিশিষ্ট ভারতীয় ভোট প্রার্থীর পক্ষে হারের পর ইভিএমকে দায়ী না করাটাই বেনিয়ম হয়ে পড়ছিল। অবশ্যই সব পরাজিত প্রার্থীই যে আদালতে গেছেন এমনটা নয়, তবে নিদেনপক্ষে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে এই প্রথার বাপান্ত না করে কেউ ছাড়েননি।

আশ্চর্যজনকভাবে মামলার প্রথম কিস্তিতে কংগ্রেস কিন্তু জিতে যায়। যদিও প্রাথমিকভাবে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ও ১৯৬১ সালে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত আইনে যে ইভিএম থাকা আবশ্যিক এমন কোনো বাধ্য বাধ্যকতা না থাকার কংগ্রেসের দেওয়া যুক্তি আদালত খারিজ করলেও ১৯৮৪ সালে সর্বোচ্চ আদালত কংগ্রেসের পক্ষেই রায় দেয়। এর পরে পুনর্নির্বাচনে কাগজের ব্যালট ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী পিল্লাইকে হারিয়ে দেন। যদিও এর ফলে আদৌ প্রমাণ হয় না যে ইভিএম মেশিন ভুল ছিল। তবুও এর পর থেকে সব পরাজিত প্রার্থীই একটা আশার আলো দেখতে পান যে হয়তো যদি পুনর্নির্বাচন হয় তাহলে জিতেও তো যেতে পারি! যা এক ধরনের মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়।

মনে রাখতে হবে, ১৯৮৪ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় একান্তই আইনগত খুঁটিনাটির ওপর ভিত্তি করে দেওয়া। কখনই ইভিএম খারাপ, ব্যালট ভাল এমনটা নির্দেশ করে দেওয়া নয়। এরপর ১৯৮৮ সালে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে (ROP Act) আরও সংশোধনী যুক্ত করে ইভিএম ব্যবহারের প্রণালী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর ইতিহাসের অমোঘ পরিহাসে ইভিএম যন্ত্র প্রয়োগের কারিগরী খুঁটিনাটি সংক্রান্ত এই সংশোধিত আইনটি কংগ্রেস সরকার পরিচালিত সংসদেই অনুমোদিত হয়— অতীতে যারাই ছিল ইভিএম নাকচ করে ব্যালট প্রবর্তনের একমাত্র সুফলভোগী দল।

স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মোট কথা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোট গ্রহণের গতি, নিপুণতা ও সর্বোপরি গণনার সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ করা যায়। শুধু তাই নয় এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগে ভোট জালিয়াতি বন্ধ হয়। গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে শর্ত অর্থাৎ ভোটদাতার নিজস্ব গোপনীয়তার অধিকার— এই দু'টি বিষয়ই ব্যালট পেপারের ভোট থেকে মেশিনের ভোটে সর্বপেক্ষা সুরক্ষিত থাকে। এই দু'টি কারণ এবং ভারতের

VVPAT সমস্ত ভোটকেন্দ্রে চালু হয়ে যাওয়ার পর ইভিএম মেশিনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে আর চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। কিন্তু হায়! দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে নির্বাচনে হারের পর নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইভিএম-কে ফাঁসিয়ে দেওয়ার মজাদার খেলাটা আর উপভোগ তো করা যাবে না।

মতো এত বিশাল দেশে কাগজের ব্যালটের এক জায়গা থেকে আরও দূরের জায়গায় স্থানান্তরিত করার বিপুল অসুবিধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই নির্বাচন আয়োগ বহু আলাপ আলোচনা, মত বিনিময়ের পর ধীরে ধীরে ইভিএম-এর প্রচলন করে। আর এই ব্যালট ভোটিং চালু থাকায় সত্তরের দশক থেকে চালু হয়েছিল ব্যাপক ভোট তছরূপ যা আমরা সবাই জানি। বহু চলচ্চিত্র নাটকে তা বিষয়বস্তু হয়ে উঠে এসেছে।

ভারতে গণতন্ত্র আজ এক দৃঢ় ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। উত্তরোত্তর তা আরও মজবুত হয়ে উঠছে। এই প্রগতি কয়েক দশকের সাধনার ফল। পাশ্চাত্যের যারা আমাদের গণতন্ত্রের টিকে থাকা নিয়ে সন্দিহান ছিল আজ তারাই আমাদের এক সফল বিজয়ীর রোল মডেল হিসেবে মেনে নিচ্ছে। আজ যাঁরা কাগজের ব্যালটে ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন তাঁরা সম্পূর্ণ ভুল বলছেন। তাঁরা ইচ্ছে করে ভুলে যাচ্ছেন কেন আমরা এই প্রথার অবলুপ্তি ঘটিয়েছিলাম। বাস্তবে যাত্রাপথে দুর্ঘটনার ব্যাপক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমরা যন্ত্রযানকে পরিহার করে কখনই ঘোড়ায় টানা গাড়ির যুগে ফিরে যাই না। আমরা পক্ষান্তরে মোটরগাড়ি, বাস সবই চালু রেখে কিছু দুর্ঘটনার প্রতিষেধক প্রয়োগ করি যেমন— গতি নিয়ন্ত্রণ, হেলমেট, সিট বেল্ট, সিগন্যাল ও নিত্যনতুন দুর্ঘটনা নিরোধক নানা যন্ত্রপাতি যা বাজারে আসছে।

হ্যাঁ, কোনো প্রযুক্তিই একেবারে অভ্রান্ত এটা কখনই অহঙ্কার করে বলা যায় না। তাই ইভিএম-এর ত্রুটি সংক্রান্ত অভিযোগগুলিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করতে হবে। আনন্দের কথা, নির্বাচন কমিশন সেটিই করছে। হয়তো আপনাদের খেয়ালে থাকবে ২০০৯ সালে কমিশন বিপুল প্রচারের মাধ্যমে নাগরিকদের ও বিভিন্ন অভিযোগকারীদের জানিয়েছিল তাঁরা যদি হাতে কলমে ইভিএম-এর কারচুপির কৌশল একটু দেখিয়ে দিয়ে যান। কেউই এগিয়ে আসেননি। ঠিক সেই রকম ২০০৪-এ দিল্লি উচ্চ আদালত ও ২০০৫ সালে কর্ণাটক উচ্চ আদালত ইভিএম কারচুপি নিয়ে আবেদনকারীদের দাবি খারিজ করে দেন। অভিযোগ খারিজ করার আগে তাঁরা প্রযুক্তিবিদ ও এ সংক্রান্ত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের মতামতও সংগ্রহ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত গত মাসে একটি ঘটনায় ইভিএম যন্ত্রে দেওয়া যে-কোনো বোতামের ভোটই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কাছে চলে যাচ্ছে বলে কমিশনে পর্যাপ্ত অভিযোগ জানানো হয়। কমিশন সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের একাধিক আধিকারিক ও প্রযুক্তিবিদদের দল তৈরি করে পরীক্ষা চালায়। অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যে-কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে একেবারে চটজলদি এই ধরনের তদন্ত চালানো, অডিট বসানো, সদা সর্বদা জনতার মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সর্বশেষ প্রযুক্তির প্রয়োগকে সর্বাগ্রে তুলে ধরা নিশ্চিতভাবে ইভিএম-এর ওপর মানুষের ভরসা ও মেশিনের নির্ভরযোগ্যতাকে সুনিশ্চিত করবে। তবে দু'টি বিষয় এখনও সম্পূর্ণ হতে বাকি আছে। একটি হলো নির্বাচন আয়োগ নির্দেশিত এক ধরনের Totaliper যন্ত্রের প্রবর্তন করা যার মাধ্যমে একাধিক ইভিএম মেশিনের প্রদত্ত ভোটকে এক লপ্তে যোগ করে নেওয়া যাবে। এটি আদালতে ও সরকারের কিছুটা আপত্তিতে আটকে আছে। এটি চালু হলে ভোটারের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ১০০ শতাংশ সুরক্ষিত হবে যেটি গণতন্ত্রের মূলাধার। কেননা সব মেশিন aggregate যোগ হলে আর বুথওয়াড়ি ফল জানা যাবে না। দলে দলে রেষারেষি কমবে।

দ্বিতীয়ত ২০১১ সালে কাকে ভোট দেওয়া হয়েছে সেটি নিশ্চিত করতে Voter Verified Paper Audit Traid (VVPAT) এখনও সেভাবে চালু করা যায়নি। এটি প্রয়োগ হলে ভোটদাতা হাতে হাতে কাগজ পেয়ে যাবেন তিনি যাঁকে ভোট দিয়েছেন ভোট তিনিই পেয়েছেন কিনা। এর আরও একটি সুফল হলো ফলাফল চ্যালেঞ্জ হলে খুব সহজেই এই স্লিপের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা যাবে। সর্বোচ্চ আদালত ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে VVPAT চালু করার বাধ্যতামূলক আদেশ দিয়েছেন। নির্বাচন আয়োগ ইতিমধ্যেই কুড়ি হাজার এই ধরনের মেশিন হাতে পেয়েছে। বাকিটার জন্য সরকারের কাছ থেকে টাকার অপেক্ষায়। (কেন্দ্র সরকার এই বাবদ অর্থ মঞ্জুরও কয়েকদিন আগে করেছে)।

একথা বলা যেতে পারে VVPAT সমস্ত ভোটকেন্দ্রে চালু হয়ে যাওয়ার পর ইভিএম মেশিনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে 'উঠল বাই কটক যাই' বলে আর চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। কিন্তু হায়! দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হারের পর ইভিএম-কে ফাঁসিয়ে দেওয়ার মজাদার খেলাটা আর উপভোগ তো করা যাবে না। ■

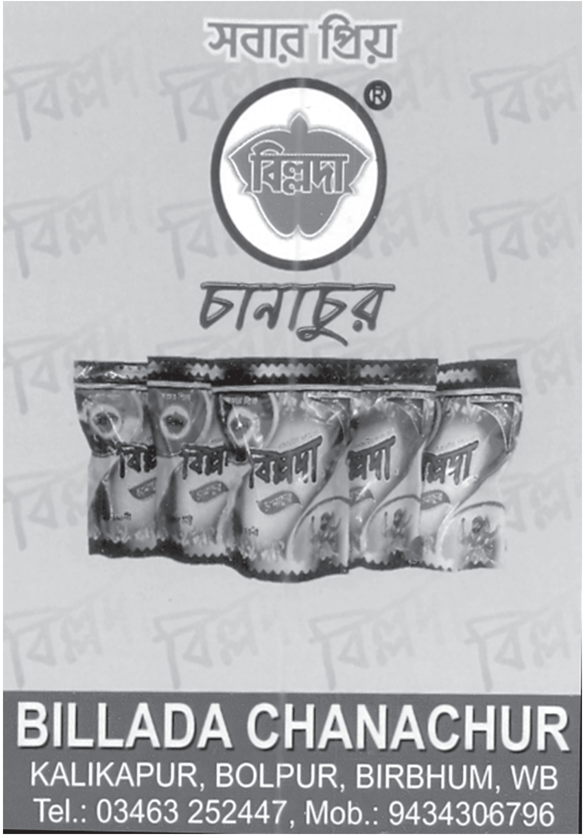

চিঠিপত্র

মা সরস্বতীকে চিঠি

মাগো,

করজোড়ে তোমাকে আমরা প্রণাম জানাই। আমরা পশ্চিমবঙ্গে তোমার একনিষ্ঠ ছোট ছোট ভক্ত। আমাদের বিদ্যালয়গুলি তোমারই সরস্বতী বা সারদা নামে নামাঙ্কিত। তোমাকে বন্দনা ও প্রণাম করে আমরা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন শুরু করি— এটাই কি আমাদের অপরাধ?

তোমার ভাষায় কথা বলার জন্য সংস্কৃত ভাষা শেখার চেষ্টা করি। তুমি আমাদের ভালো থাকা ও হওয়ার যেসব কথা সুভাষিতের মাধ্যমে বলেছো, তা মানা ও মনন করার চেষ্টা করি। আর তোমার কৃতী সন্তানগণ (বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ) যেভাবে বড় হয়েছেন তাদের প্রদর্শিত পথে চলার চেষ্টা করি। সেটাই কি আমাদের আর এক অপরাধ?

আমরা সুস্থ থাকার জন্য প্রতিনিয়ত ব্যায়াম ও যোগাসনের অভ্যাস করি অপরকে পীড়নের জন্য নয়। সুস্থ-সবল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা কি আমাদের অপরাধ?

আমাদের বিদ্যালয়গুলি সমাজের শুভানুধ্যায়ীগণের অনুদানে পুষ্ট, অর্থাৎ সমাজ-পোষিত বিদ্যালয়, সরকার-পোষিত বিদ্যালয় নয়। তবুও আমাদের বিদ্যালয়গুলির ভবন ও সাজসজ্জা অতি মনোরম। আমাদের ভাই-বোনদের জন্য আলাদা শৌচালয় ব্যবস্থাও আছে। সব মিলিয়ে বিদ্যালয়গুলি মন্দিরের মতো। যেখানে তোমার অধিষ্ঠান বা যে স্থান তোমার নামে নামাঙ্কিত সেটা তো মন্দির হবেই। আমাদের বিদ্যালয় হলো মন্দিরসম, এটাই কি অপরাধ?

এখানকার আচার্য-আচার্যাগণ (দিদিভাই-দাদাভাই) আমাদের মন্দিরের ভগবান রূপে পূজা করেন, অর্থাৎ পাঠদান করান। তার ফলে আমরা অনেক কিছু ভালো ভাবে শিখতে পারি। মানুষের মতো মানুষ হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারি। মানুষ হওয়াটা কি অপরাধ?

যদি এগুলি কোনো অপরাধ না হয়, তা হলে কেন পশ্চিমবঙ্গে আমাদের এই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে নরকে ঠেলে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে?

তাঁরাও তো তোমার সন্তান! তাহলে কেন তুমি তাঁদের সঠিক দিশা দেখাচ্ছে না? কেন তাঁদের মানা করছো না? কেন তাঁদের ভুল শুধরে দিচ্ছ না?

যদি আমাদের ছোটো শিশু বলে অবজ্ঞা করো, অবহেলা করো, তুচ্ছ করো, তা হলে ভুল করছো। তুমি তো জানো--- বীর অভিমন্যু, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, যতীন দাস, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা আরো অনেকেই, তাঁরা সকলেই ছোটো ছিলেন। তাঁদের সেই রূপ যেন আমাদের দেখাতে না হয়।

শেষে তোমাকে করজোড়ে আবার মিনতি জানাই— তুমি আমাদের প্রাণের স্থানটিকে কেড়ে নিতে দিও না। তোমার নিত্য আরাধনার স্থলটিকে কলুষমুক্ত রাখতে আমাদের সাহায্য করো। বর্তমানে তোমার কৃতী সন্তান তৈরির কারখানাটি বন্ধ করতে দিও না। মা, মাগো তুমি আমাদের প্রার্থনা শোন। আমাদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করো। মা, মাগো, যেন আমরা আবার প্রাণ ভরে তোমায় ডাকতে পারি।

—তোমার ভগ্ন হৃদয়
সরস্বতী/সারদা শিশুমন্দিরের
ভাই-বোনেরা।

রামনবমীর সশস্ত্র মিছিল

সম্প্রতি শোরগোল পড়ে গেছে রামনবমীতে সশস্ত্র মিছিল বের করার জন্য, বিশেষ করে সেকুলারপন্থী ও মুসলমান নেতাদের। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার কয়েকটি প্রশ্ন তাদের সামনে তুলে ধরলাম।

১৯৫১ সালে জনসঙ্ঘ দল প্রতিষ্ঠার পর এবং পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গে জনসঙ্ঘের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আজকে গেরুয়াবাহিনীর ওদের কথায় এত রমরমা কেন? ৭০-এর দশক থেকে যেরকমভাবে মৌলবাদীদের রমরমা শুরু হয়েছে এবং শাসকদল তাদের তোষণ করছে, তাতে দলমত নির্বিশেষে হিন্দুরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। ভোটের সময় দলগুলি ইমামদের ভোট ভিক্ষা করে। যার প্রথম সূচনা করেছিলেন এইচ এন বহুগুণা। অপরপক্ষে হিন্দুদের সেন্টিমেন্টকে তোয়াক্কা না করে হিন্দুদের আরো শঙ্কিত করে তোলে। তার ফলস্বরূপ রামমন্দির আন্দোলন বা জয়শ্রীরাম ধ্বনি। এই রামমন্দির আন্দোলনের ফলে হিন্দুদের মধ্যে একটা একতা সংঘটিত হয়, যেটাকে ভাঙার ভি পি সিং মণ্ডল কমিশন চালু করেন। সুতরাং ওই সেকুলারবাদীদের বলছি আজকে আপনাদের ভাষায় গেরুয়াকরণ আপনাদেরই ভুল নীতির ফসল। হিন্দুরা নিজেদের ভবিষ্যৎ বা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে এক সন্তান নীতি গ্রহণ করেছে, অপরপক্ষে মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতকে মুসলিমস্থান বানানোর জন্য বহুবিবাহ বা জনবিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে অধিক সন্তান উৎপাদন করে। ২০৬০ সালের মধ্যে মুসলমান মহিলারা বেশি সন্তানের জন্ম দেবে। সারা পৃথিবীতে যদিও ২০৩৫ সালের মধ্যে খ্রিস্টানদের জন্মহার বেশি থাকার কথা বলা হয়েছে। (পিউ রিসার্চ-এর সমীক্ষা, ৬ এপ্রিল ২০১৭)। সুতরাং গেরুয়াঝড় থামাতে হলে নিরপেক্ষ সুশাসন করুন, নাহলে গেরুয়াঝড় কেন গেরুয়া সুনামি হয়ে যাবে।

এবার আসি সেকুলারবাদীদের ভাষায় সশস্ত্র রামনবমীর মিছিল প্রসঙ্গে। হিন্দুদের অধিকাংশ দেবদেবীর হাতে ত্রিশূল, তরবারি, বল্লম, কাতান ছোরা থাকে। সুতরাং ওইসব দেবদেবীর চেলাদের হাতে অস্ত্র থাকাটা খুব একটা দোষের দেখি না। সর্বোপরি ওই সমস্ত অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ বা এলাকা দখল হয় না, এখন বোমা, বন্দুক, পাইপগান হচ্ছে অস্ত্র। অপরপক্ষে মুসলমানদের মহরমের মিছিল

একদলের কাছে দুঃখের, অপরদলের কাছে আনন্দের দিন। সুতরাং ওই মিছিলে ছোরা বল্লম কাতান, তরবারি থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও প্রতিবছর সেই মিছিল হয় এবং তৃণমূলের নেতাদেরও ওই মিছিলে দেখা যায়। প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা বিপরীতমুখী সমান প্রতিক্রিয়া আছে এবং আজ তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

—**কমল মুখোপাধ্যায়,**
চুঁচুড়া, হুগলি।

দেবীর বাম প্রীতি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মান্যবরেষু। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যজ্ঞে আপনার দুর্বার গতি সিপিআই (এম) কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। পদে পদে আপনার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। ২০১১ সালে আমরা সিপিএম-কে ছুঁড়ে ফেলে আপনাকে বেছে নিয়েছি। তারপর থেকেই আস্তে আস্তে আপনার আসল মুখোস খুলতে আরম্ভ করল। বামেদের সন্ত্রাসে হাজার হাজার মানুষকে গুলি করে মেরে মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয়েছিল— সেই সময়ের মায়ের কান্না আজও নিশুতি রাতে আমরা শুনতে পাই। গদিতে বসার পর একটু অভিনয় করে এক দুটো কেস-ফাইল করেছিলেন। আদালত পর্যন্ত সুশান্ত ঘোষ, সুকুররা হাসতে হাসতে গিয়েছিলেন, পরে দেখা গেল সবাই বুক ফুলিয়ে আপনার সঙ্গে করমর্দন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিগত লোকসভা ভোটে বিজেপি ১৭-১৮ শতাংশ ভোট পাওয়ায় আপনার একটু ভয় হলো এই ভেবে যে পাছে সিপিআই (এম)-এর সাধারণ সমর্থকেরা বিজেপি-র পাশে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তাই দাঁড়িপাল্লা সমান রাখতে বিশিষ্ট বাম নেতাদের নবান্নে নেমতন্ন করলেন এবং অমলেট, কাটলেট, ফিশফ্রাই ইত্যাদি পরিবেশন করে বললেন— 'আপনারা সাহস সঞ্চয় করুন— আমরা আছি তো'? আর যায় কোথায় ওরাও তেড়ে ফুড়ে লেগে গেল। জেলায় জেলায় সমাবেশ করে কলকাতায় জনসভার ডাক দিল।

এরপর গ্রামে ফিরে এসে সিপিআই (এম)-এর মাতব্বররা তাদের অনুগামীদের বোঝাল— 'দেখলি কত লোক— এবার মমতাকে বাংলো ছাড়া করবই"। ব্যাস কাজ হয়ে গেল। পরের বিধানসভা ভোটে বিজেপি ১৭-১৮ শতাংশ থেকে ৯-১০ শতাংশে চলে গেল। আর এখন শুধু আপনার পেছনে লাগা ছাড়া সিপিআই (এম) পার্টিটার আর যেন কিছু কাজই নেই। কীরকম বিশ্বাসঘাতক দেখুন। বিজেপি-র আতঙ্কে একদিন হঠাৎ করে বুদ্ধবাবুকে 'ভাল মানুষ' বলে সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললেন।

এরপর আসি আপনার উন্নয়নের প্রশ্নে। ওটাতো কলকাতা থেকে দার্জিলিং যেখানেই যাবেন অনুভব করতে পারবেন। গোটা পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনো বাতিস্তম্ভ নেই— যেখানে আপনার একটা লম্বা চওড়া সুন্দর হাসি মুখের পোস্টার নেই। তাছাড়া টেট, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানানোর জন্যই হোক অথবা টয়লেট উদ্বোধনেই হোক সর্বত্রই আপনার হাসি মুখের ছবি। কোনো কোনো ছবির নিচে আবার আপনাকে 'দেবী' বলেও সম্বোধন করা আছে (যাদবপুর থানা থেকে কালিকাপুর)। উন্নয়নের ইচ্ছে থাকলে ওই টাকাগুলোতে একটা জেলার সার্বিক উন্নতি অবশ্যই হোত। কলকাতার যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি দেখলেই বোঝা যায় আপনি ৫ বছরের বেশি থাকতে আসেননি।

আপনি বোধ হয় জানেন না অপদার্থ, দেশদ্রোহী (সিপিআইএম), পরিকল্পনাহীন আবেগপ্রবণ (তৃণমূল) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দিয়ে কোনো উন্নয়নেই সম্ভব নয়। তাই এখন পড়েছেন শেষ খেলায়— পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন নিয়ে।

হার্মাদদের ভোজ সভাতে অধীর পাড়ে পাত,
তাই না দেখে দিদিমণি দিচ্ছে বেড়ে ভাত।

আগামী ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে আমরা উপরোক্ত সমীকরণের অপেক্ষাতেই রইলাম।

—**মনতোষ বসু,**
রামপুর, বাঁকুড়া।

শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি খোলা চিঠি

সম্প্রতি আপনার (শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়) লেখা একটি কবিতা চোখে পড়ল, 'অভিশাপ'। সেই প্রসঙ্গেই এই চিঠি। আমি আপনার মতো স্বনামধ্য কেউ নই, অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ, অবশ্যই সমাজসচেতন। সে কারণেই এই পত্রের অবতারণা।

আপনার 'অভিশাপ' শীর্ষক অনবদ্য কবিতাটি পাঠ করে আমার কলম থেকেও একটি কবিতা বেরিয়ে এল :

"সময়ে ওষুধ পড়লে সেরে যায় তোষণের নীতি,
প্রশ্রয় পেতে পেতে নষ্ট করো দেশের সংহতি।
যখন ফতোয়া জারি 'জেহাদ ছড়াও দিকে দিকে,
লুটপাট, আগুন আর ধর্ষণ কাফের নারীকে।
ধর্ষিতা নারীর কান্না জাগায় না কোনও আলোড়ন,
মূর্তিপূজক ওরা, তাই নেই কোনও আন্দোলন।
যখন আকাশে বাতাসে ওঠে গণতন্ত্রের জয়গান,
তোমার ব্যথিত চিত্তে বেজে ওঠে স্তিমিত আজান।
যে মজহবে আছে লেখা পরাজিত দেশ-নারী শুধুই ভোগের,
মার খাওয়া স্বজাতির জয়ে লেখো কবিতা শোকের?
কে কোথায় কী বলেছে, তাই খোঁজো নিজ নিরাপত্তা,
জেহাদ-প্রশ্রয়ী কাছে তাই বেচে দাও নিজ সত্তা।
তোমার ধর্মের কেউ আজ অবধি মৃতদেহ করেনি ধর্ষণ,
জহর ব্রতের উদ্ভব কেন হয়েছিল জেনে কোরো গর্জন।
যেদিন কন্ডোম তুমি পরাবে পবিত্র ত্রিশূলে,
তোমার ঘুমন্ত বিবেককে জাগাবো বহু বিজ্ঞাপিত জাপানের তেলে।"

—**সৌদামিনী চট্টোপাধায় (অধ্যাপিকা),**
৪২নং বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯।

আদি সাংবাদিক দেবর্ষি নারদ এবং সংবাদমাধ্যম

পরম্পরা

সাধন কুমার পাল

ভারতীয় মিডিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম বলেছিলেন— 'Why is the media here so negative ? Why are we in India so embarrassed to recognize our own strengths, our achievements ? We are such a great nation. We have so many amazing success stories but we refuse to acknowledge them. Why ?... There are millions of such achievements but our media is only obsessed in the bad news and failures and disasters.' দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ইজরায়েলি মিডিয়ার উদাহরণ টেনে এনেছিলেন। একবার ইজরায়েল সফরের সময় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হামাসের প্রবল আক্রমণে বোমাবাজি, গোলাবাজি হয়। ফলস্বরূপ হতাহত ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। কিন্তু পরেরদিন তেলআভিভে বসে সংবাদপত্র চোখ রেখে তিনি অবাক হয়ে যায়। দেখলেন ইজরায়েলি সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতায় এত বড় ঘটনা স্থান পেলো না। প্রথম পাতায় সচিত্র প্রতিবেদন হিসেবে স্থান পেলো এক ইহুদি ভদ্রলোক কীভাবে পাঁচ বছরের পরিশ্রমে মরুভূমিতে ফসল ফলিয়েছেন সেই খবর। হামাসের আক্রমণের খবর অন্যান্য খবরের সঙ্গে ভিতরের পাতায় স্থান পেলো। শক্তিশালী দেশ গড়তে মিডিয়া কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ড. কালামের বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সংবাদদাতা দেবর্ষি নারদ রচিত নারদ ভক্তিসূত্রের বিভিন্ন শ্লোকে যে সমস্ত বিধিনিষেধ ও দায়িত্ববোধের উল্লেখ রয়েছে আধুনিক মিডিয়া সম্পর্কে ড. কালাম উত্থাপিত প্রশ্নগুলি তারই প্রতিফল।

প্রশ্ন উঠতে পারে হঠাৎ করে 'বিদুষক', 'কলহ প্রিয়' হিসেবে চিহ্নিত দেবর্ষি নারদের মতো একটি পৌরাণিক চরিত্রকে তুলে ধরার প্রয়াস কেন? কিছু সিনেমা সিরিয়ালে নারদ চরিত্রকে বিকৃত করে হাস্যরসের উপাদান হিসেবে তুলে ধরার ফলে জনমানসে দেবর্ষি সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। অথচ পুরাণ বলছে নারদের মতো আদর্শ চরিত্র কমই দেখা যায়। স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কেন প্রতিদিন নারদের নাম জপ করেন। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন এই ত্রিলোকে দেবর্ষি নারদের থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। নিজের জন্য নয়, নারদ সর্বদাই ত্রিলোকের মঙ্গলের কাজই কাজ করেন। সে জন্যই তিনি প্রতিদিন নারদের নাম জপ করেন।

গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, লোক কল্যাণের জন্য কলহ যেখানে অনিবার্য ঠিক সেই সমস্ত জায়গাতেই তিনি নিজেকে কলহপ্রিয় হিসেবে উপস্থাপিত করতেন। যেমন, ত্রিলোক বিজয়ী অহঙ্কারী দানব জলন্ধরের দাপটে যখন সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে তখন 'কলহপ্রিয় চরিত্র' নিয়ে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন দেবর্ষি নারদ। জলন্ধর তখন ত্রিলোকের সবচেয়ে সুন্দরী রমণীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দেবর্ষি নারদ জানতেন অজেয় এই দানব একমাত্র শিবের হাতেই বধ্য। তিনি এই দানবের কামনা পূর্তির সহায়ক হয়ে উঠলেন। জলন্ধরকে জানালেন এই ত্রিলোকে মাতা পার্বতীর চেয়ে সুন্দরী ও কৈলাসের চেয়ে সুন্দর জায়গা আর নেই। মাতা পার্বতীকে লাভ করার জন্য জলন্ধর কৈলাস আক্রমণ করলে শুরু হলো যুদ্ধ। সেই যুদ্ধেই শিবের হাতে নিহত হলেন প্রবল পরাক্রমশালী এই দানব। তিন লোকেই সুখ ও শান্তি পুনস্থাপিত হলো।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আপাত দৃষ্টিতে অলৌকিকতা ও অবিশ্বাস্য ঘটনাবলির মোড়কে আবৃত্ত থাকলেও পুরাণের চরিত্রগুলি সত্য, ন্যায়, নীতি এবং দানব থেকে দেবতা হয়ে উঠার মতো শ্রেষ্ঠত্বের সাধনা ও মূল্যবোধের মতো আদর্শের মণিমুক্তো খচিত। শাশ্বত সনাতন এই সমস্ত আদর্শ যুগে যুগে মানব সভ্যতাকে পথ প্রদর্শন করে এসেছে। দেবর্ষি নারদ বাস্তবে ছিলেন কী ছিলেন না, এই চরিত্রের সঙ্গে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলি সত্য কী মিথ্যা, তা প্রতিপন্ন করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সংবাদদাতা হিসেবে দেবর্ষি নারদের জীবনদর্শন এক কলোত্তীর্ণ আদর্শ। শুধু আধুনিক সংবাদজগৎ নয়, দেবর্ষি নারদের জীবনাদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও এক অনুসরণ যোগ্য আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। দেবর্ষি নারদের চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কালোত্তীর্ণ এই আদর্শের উপর আলোকপাত করাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'spirituality is the soul of India.' পরম্পরা অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উচ্চ আদর্শের প্রতীক একজন দেবতাকে পুজো দিয়ে সেই কাজের শুভারম্ভ করা হয়। যেমন বিদ্যার্থীরা সরস্বতী পুজো করেন, ব্যবসায়ীরা গণেশ পুজো করেন, নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্তরা বিশ্বকর্মা পুজো করেন। সমগ্র জীবন দিয়ে মানুষ নিজ নিজ ক্ষেত্রের ওই উচ্চ আদর্শকে আয়ত্ত করার প্রয়াস করেন। এই প্রয়াসের নামই সাধনা।

সাধনা শব্দটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে এমন একটি ভাব যার সাহায্যে মানুষ অনুভব করে ব্যক্তি হিসেবে সে এই সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং নিজের প্রাত্যহিক কাজের মাধ্যমে এই সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করাই তাঁর জীবনের অন্তিম লক্ষ্য। ভারতের একান্ত নিজস্ব এই আধ্যাত্মিক ভাবকেই স্বামীজী ভারতের আত্মা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ভাব থেকে বিচ্যুতিই সমস্ত ধরণের স্খলন, পতন, দুর্নীতি, ক্ষুদ্রতার উৎস। সন্দেহ নেই ভারতীয় মিডিয়াও এই স্খলন পতনের সমস্যায় জর্জরিত। এই স্খলন পতন এতটাই যে মিডিয়ার একাংশ এখন ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ, কায়েমি ক্রীড়নক হয়ে উঠছে। এই বিচ্যুতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে মিডিয়া সম্পর্কে ড. কালাম উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর।

ভারতীয় ভাবধারায় যাকে কর্ম সাধনা বলা হয় পাশ্চাত্য ভাবধারায় সেইটিকে পেশা বা পেশাদারিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্যক্তির সমৃদ্ধিই পেশা বা পেশাদারিত্বের চরম ও অন্তিম লক্ষ্য হলেও সেই দেশের ভাব ও সংস্কৃতি অনুযায়ী কিছু উচ্চ ভাবনাও নিহিত থাকে। যা থেকে বিচ্যুতির অর্থ অধঃপতন। ইতিহাস বলছে এই ভারতীয় পরম্পরাকে সামনে রেখে ১৯২৬ সালের ৩০ মে নারদ জয়ন্তীর দিন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সাংবাদিক দেবর্ষি নারদকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কলকাতায় ভারতের প্রথম হিন্দি সাপ্তাহিক 'উদন্ত মার্তণ্ড' আত্মপ্রকাশ করে।

দেবর্ষি নারদের সময় আজকের দিনের মতো প্রিন্ট, ইলেকট্রিনিক বা সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। সে সময় সংবাদ আদান প্রদান হতো মৌখিক ভাবে। এক সঙ্গে অনেক মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছনোর জন্য মেলা, তীর্থস্থান, হাট বাজার, ধর্মীয় জমায়েতগুলি কাজে লাগানো হোত। একজন আদর্শ সাংবাদিক হিসেবে দেবর্ষি নারদের দেব, মানব ও দানব এই তিন লোকেই অবাধ বিচরণ ও সমান বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল। যুদ্ধের মতো সঙ্কটময় মুহূর্তেও দেবর্ষি নারদ অবাধে যাতায়াত করতেন এবং নিরপেক্ষ ভাবে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করতেন। নারদের দেওয়া তথ্য কোনো পক্ষই হালকা ভাবে নিতেন না। সাংবাদিকতা কাজের জন্য যে সমস্ত গুণের বিকাশ হওয়া আবশ্যক দেবর্ষি নারদের চরিত্রে সেই সমস্ত গুণ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল। ব্রহ্মজ্ঞানী এই ঋষির জীবন দর্শনের মূল কথা ছিল 'লোককল্যাণ'। পুরান অনুসারে তিনি ছিলেন ৬৪টি বিদ্যায় পারদর্শী এক চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। কোনো ধারণা ও পরিস্থিতিকে তিনি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারতেন। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমেই উঠে আসতো ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে তার অনুমান। একমাত্র দেবর্ষি নারদকেই 'দেবতাদের মন' বলা হোত। কারণ কিছুক্ষণ কথা বলেই তিনি শুধু দানব ও মানব নয় দেবতাদেরও পড়ে ফেলতে পারতেন।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের জন্য দেবর্ষি নারদ যেভাবে প্রয়াসী হয়েছেন মানব সমাজের কাছে চিরকালই তা প্রেরণার উৎস হিসেবে গণ্য হতে পারে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নিজের অসম্পূর্ণতা নজরে আসতেই তিনি কঠোর তপস্যার মাধ্যমে নিজেকে উচ্চমানের সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তপস্যা করে ভগবান বিষ্ণুর কাছে বর লাভ করেন। নারদ সংহিতা নামক সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। বীণা নামক বাদ্যযন্ত্রটি দেবর্ষি নারদেরই সৃষ্টি।

তিনি নারদ ভক্তিসূত্র নামক গ্রন্থের রচয়িতা। নারদ ভক্তিসূত্রে আত্মা পরমাত্মা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট তিনি উচ্চমানের দার্শনিক ছিলেন। অন্যান্য ঋষির মতো দেবর্ষি নারদের কোনো আশ্রম ছিল না। লোক কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদাই বার্তাবাহক হিসেবে ভ্রমণ করতেন। দেবর্ষি নারদের প্রত্যেকটি বার্তা, বাক্য ও উপস্থাপিত বিষয় সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নিজের হিতের জন্য নয় তিনি যা করেছেন সবই লোক হিতের জন্য।

শুধুমাত্র আত্মতত্ত্ব নয়, নারদ ভক্তিসূত্রের ব্যাপক ব্যবহারিক তাৎপর্যও আছে। যেমন, ভক্তি সূত্রের ৪৩তম সূত্রে বলা হয়েছে পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন অবাঞ্ছনীয়কে পরিত্যাগ করতে হবে। যা কিছু অবাঞ্ছনীয় তার প্রচার প্রসার প্রতিপালন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থাৎ নেতিবাচক সাংবাদিকতা এই সমাজের জন্য বিষতুল্য।

৬৩ তম শ্লোকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দেবর্ষি নারদ সংবাদ হিসেবে পরিবেশনায় ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। যেমন এক, স্ত্রী বা পুরুষের শরীর বা তার মোহের বর্ণনা করা যাবে না। দুই, নাস্তিকতার বর্ণনা করা যাবে না, তিন শত্রুর চর্চা করা যাবে না। ৭৮ তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে-কোনো মানুষের মধ্যেই অহিংসা, সত্য, শুদ্ধতা, সংবেদনশীলতা এই সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ আবশ্যক। সংবাদদাতাদের মধ্যেও এই সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটবে এটাই প্রত্যাশিত।

বাল্মীকি দস্যুবৃত্তি করে পরিবার চালাতেন। একদিন দেবর্ষি নারদকে অর্থ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করলে দেবর্ষি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর পরিবার তাঁর পাপের ভাগী হতে চায় কিনা! নারদের মন্ত্রণায় তিনি তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে এ প্রশ্ন করলে সকলেই জানায় যে তাঁর পাপের ভাগী তাঁরা হতে চায় না। ওই দস্যু জীবনের সত্যতা উপলব্ধি করে নারদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। নারদ তাঁকে রাম নাম জপ করতে শেখান। ওই দস্যু বহু বছর সাধনা করে ব্রহ্মা'র নিকট বরলাভ করে কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হন। তপস্যারত অবস্থায় তাঁর দেহ বল্মীকের স্তূপে ঢেকে গিয়েছিল বলে তাঁর নামকরণ হয় বাল্মীকি। দেবর্ষি নারদের জন্যই রামায়ণ রচিত হয়েছিল।

ঋষি বাল্মীকি ১৬টি গুণসম্পন্ন একজন আদর্শ মানুষের খোঁজে ছিলেন। দেবর্ষি নারদ ৫৭টি গুণসম্পন্ন পুরুষোত্তম রামের সন্ধান দেন। সুবক্তা ও অসাধারণ বিশ্লেষক দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনি শুনে ঋষি বাল্মীকির মনে রামায়ণ রচনার ভাবনা আসে। তিনি ধ্রুবকে তপস্যা ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ দেখিয়েছেন। প্রহ্লাদকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণরাজপুরে অবরুদ্ধ হলে তিনি দ্বারকায় ওই সংবাদ প্রদান করে দৈত্যবিনাশে সহায়তা করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় অনেক অসুরের জীবন নাশ হয়। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করলে দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীর জন্য পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যাতে মতবিরোধ না হয়, তার নিয়ম নির্ধারণ করতে উপদেশ দেন। ফলত লোক কল্যাণের জন্য সকল স্থানেই দেবর্ষি নারদকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও স্বেচ্ছায় উপস্থিত হতে দেখা যায়। শুধুমাত্র সংবাদ আদান প্রদান নয়, দিকভ্রান্ত মানুষ ও সমাজকে সঠিক দিশা দেওয়াও যে একজন সাংবাদিকের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে আদি সাংবাদিক দেবর্ষি নারদ সে আদর্শও প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

প্রফেসর, এফ. ম্যাক্স ম্যুলার : (১৮২৩-১৯০০)
পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির অন্যতম বিশিষ্ট দার্শনিক, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ পণ্ডিত। তাঁর সময়ে পাশ্চাত্যে তিনিই ছিলেন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যিনি অসংখ্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার অন্বেষণ থেকেই জানা যাবে ইউরোপীয় সভ্যতার উৎপত্তির ইতিহাস। সেই ধারণা থেকেই তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা এবং বেদের চর্চা শুরু হয়।
উদ্ধৃতি : এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়কারী ধারণা উদ্ভব হয়েছিল বেদ থেকে মূলত উপনিষদ থেকে।
উৎস : দ্য সিক্স সিস্টেম অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি— ম্যাক্স ম্যুলার।
উদ্ধৃতি : অন্যান্য সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের তুলনায়, বেদান্ত দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা একাধারে ধর্মগ্রন্থ এবং দর্শনশাস্ত্রও বটে।
উৎস : থ্রি লেকচারস্ অন বেদান্ত ফিলোজফি— ম্যাক্স ম্যুলার।
উদ্ধৃতি : সবচেয়ে প্রাচীন উপনিষদগুলিই হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ এবং মানব সভ্যতার অতি আশ্চর্যকর জ্ঞানসম্পদ।
উৎস : হিন্দুইজম ইনভেডস আমেরিকা— ওয়েলডেল থমাস।

ফ্রেডেরিক হেগেল : (১৭৭০-১৮৩১)
পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির অন্যতম দার্শনিক এবং সাহিত্যিক। সব বাস্তব বিষয়ের ইতিহাসমূলক এবং আদর্শগত বিশ্লেষণ ইউরোপীয় দর্শনে আনে যুগান্তকারী বিপ্লব। তাঁর দর্শন পরবর্তীকালে সরকারি শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক কাঠামো ও ধারণামূলক পরিকল্পনাগুলিকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।
উদ্ধৃতি : বিশ্ব ইতিহাসে ভারতের বিশেষ অভিঘাত এই দেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রেরণার সৃষ্টি করেছে।
উৎস : এ সার্ভে অফ্ হিন্দুইজম : ক্লস. কে. ক্লস্টারমেয়ার।
উদ্ধৃতি : ভাল করে না জেনেই, সহস্রাব্দ থেকে ইউরোপীয়দের কল্পনায় ভারতভূমি ছিল যেন এক বিস্ময়দেশ। তার প্রাকৃতিক সম্পদ, ধনসম্পত্তি এবং বিশেষ করে জ্ঞানভাণ্ডারের সুখ্যাতি মানুষকে প্রলুব্ধ করেছিল।
উৎস : কন্টেস্টিং দ্য মাস্টার ন্যারেটিভ— জেফ্রি কক্স, শেল্টন স্ট্রমকুইস্ট।

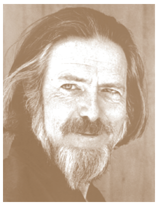

অ্যালান ওয়াট্স : (১৯১৫-১৯৭৩)
পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক এবং বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় বহুপঠিত সাহিত্যিক।
উদ্ধৃতি : প্রকৃতপক্ষে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কার করে তা আণবিক বোমার সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছিল, ঠিক তখনই প্রাচ্যের সভ্যতা বিকাশ করছিল চেতনার নতুন নতুন স্তর।
উৎস : দ্য লিগেসি অফ্ এশিয়া অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ম্যান— অ্যালান ওয়াট্স্।
উদ্ধৃতি : ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে আপেক্ষিকতাবাদ নতুন কিছু আবিষ্কার ছিল না। যেমন তাদের কাছে আলোকবর্ষের ধারণাও কোনো আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কারণ তাঁরা ছিলেন লক্ষ লক্ষ কল্পবর্ষের ব্যবহারে অভ্যস্ত (এক কল্পবর্ষ = প্রায় ৪, ৩২০,০০০ বৎসর)।
উৎস : স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিসে্স অব ইন্ডিয়া—ফ্রেডিক স্পাইজেল্‌বার্গ।

কার্ল জুং : (১৮৭৫-১৯৬১)
পরিচিতি : তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুইস্ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, এক প্রভাবশালী চিন্তা- বিদ এবং বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ যা 'জুঙ্গিয়ান মনোবিদ্যা' হিসেবে খ্যাত।
উদ্ধৃতি : আজকের দিনে পতঞ্জলি যোগের থেকে শরীর ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আর বেশি কেউ জানে না। যখন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো জিনিসকে বিজ্ঞানসম্মত স্বীকার করে, তখন পাশ্চাত্যের লোক তাকে সহজেই স্বীকার করে নেয়। সেই বৈশিষ্ট্য যোগের মধ্যে আছে। নতুন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ছাড়াও অর্ধ-উপলব্ধ অথচ মুগ্ধকারী যোগক্রিয়া সহজেই বহু অনুগামীকে আকর্ষিত করার শক্তি রাখে। এতে আছে নিয়ন্ত্রণযোগ্য অনুভবের সম্ভাবনা। 'তথ্যের' বৈজ্ঞানিক প্রমাণও এতে পাওয়া যায়। এই যোগ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রযোজ্য এবং এটা চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। তাছাড়া ইহার গভীরতা ও ঔদার্য এবং ইহার তত্ত্ব ও পদ্ধতি এমনই, যে ইহা বহন করে এক অচিন্তনীয় সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি।
উৎস : 'লেট্স ব্রিগেন আওয়ার লস্ট সোল'— নানি. এ. পাল্কিওয়ালা।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁডুলি। সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী, নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

সংশোধনী

গত ১৭ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ সংখ্যার ৪৩ পৃষ্ঠায় ড. শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'স্বাধীনতা আন্দোলন সঙ্ঘ বনাম বাম' প্রবন্ধে '২০০৯ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' এবং 'ইতিপূর্বে ২০০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার' স্থানে যথাক্রমে ১৯০৯ এবং ১৯০৫ হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

নারীমুক্তির বাণিজ্যকরণ

অঙ্গনা

।। সুতপা বসাক ভড়।।

কয়েকদশক আগে পর্যন্ত নারীমুক্তি নিয়ে এত হইচই হোত না। বেশিরভাগ মহিলাই সাংসারিক কাজকে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক কাজ, পড়াশুনা, সেলাই, গান-বাজনা ইত্যাদি শখ- শৌখিনতায় সময় কাটাতেন। এতে মানসিক তুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার এবং সমাজেরও কল্যাণ সাধন হোত। ওইসব মহিলার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল, সম্মান ছিল তাঁদের নিজেদের পরিবারেও। ফলে তাঁরা কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে পরিবারকে সবার ওপরে রেখে তারপর নিজেদের শখ-আহ্লাদকে প্রাধান্য দিতেন। এইভাবে দু'দিকেই তাঁরা সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতেন। ফলে পরিবার এবং সমাজ উভয়ই উপকৃত হোত। এখন নারীমুক্তির নাম নিয়ে যা চলছে, তা একদম উল্টো।

দূরদর্শন বা চলচ্চিত্রে সাধারণত ঘরোয়া মেয়েদের নারীমুক্তির মাধ্যম বা উদাহরণ হিসেবে পরিবেশন করা হয় না। সেখানে স্থান কেবলমাত্র কর্মরতা মহিলাদের। এই মহিলারা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর। দূরদর্শনের বিজ্ঞাপনে দেখি, তারা দামি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দামি 'ওয়াশ-রুমে' যান। সেখানে দামি টাইলস্, কল, গিজার, সুগন্ধি, বয়স কমাবার সাবান, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার সবকিছু থাকে। এরপর তারা দামি কোম্পানির জামা-কাপড়, জুতো, প্রসাধনী ব্যবহার করেন। দামি কোম্পানির চা-জলখাবার খেয়ে দামি গাড়িতে কর্মক্ষেত্রে যান। তখন তাঁরা 'ক্যারি' করেন দামি স্মার্টফোন, ঘড়ি, ল্যাপটপ ইত্যাদি। দুপুরের খাবার এবং পানীয় বেশিরভাগই বিদেশি কোম্পানি থেকে 'অর্ডার' দিয়ে আনানো হয়। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে তারা আবার বিশেষ কোনো কোম্পানির প্রস্তুত প্রসাধনে নিজেদের সুসজ্জিত করে বিশেষ কোম্পানির তৈরি খাবার, মশলা, পানীয় ইত্যাদি দিয়ে রাত্রের খাবারের আয়োজন করেন। বাইরে খেতে হলে তারা দামি রেস্তোঁরায় যান। গয়না, তাও ব্র্যান্ডেড! টিভিতে ওই মহিলাদের জীবনযাত্রা এমনভাবে পরিবেশন করা হয় তারা কি সত্যিই তাই? অথচ, যাঁরা টিভির বিজ্ঞাপনে ওই মহিলাদের দেখেন, তাঁদের মনেও ইচ্ছা হয় ওইরকম জীবনযাত্রা নির্বাহ করার। আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতার নামে

ভোগবাদকে পরিবেশন করছে ভারতের মতো একটি বিশাল অর্থনৈতিক বাজারের দেশে। লাভবানও হচ্ছে তারা। মহিলাদের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই ওইসব কোম্পানির কাছে। তাঁরা চায় আকর্ষক নারীদেহ। ঘোমটার আড়ালে থাকা মহিলাদের অর্ধনগ্ন করে পরিবেশন করে তারা অনেকটা বাণিজ্যিক লাভ করতে চায়। এমনকী, পুরুষদের অন্তর্বাস, প্রসাধনী থেকে শুরু করে তাদের ব্যবহার্য সব জিনিসেই উত্তেজকভাবে নারীদেহের ব্যাপক প্রদর্শন করা হয়। এই নারীমুক্তি কি আমাদের কাম্য?

টিভির অনেক চ্যানেল আবার মহিলাদের সঙ্গে হওয়া দুষ্কর্মকে এমনভাবে সম্প্রচার করে, তখন মনে হতে পারে যে ভারতের প্রায় সব মহিলাই নির্যাতিতা এবং অধিকাংশ পুরুষই দুষ্কৃতকারী। আসলে এই ধরনের খবর জনপ্রিয় বানিয়ে বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি তাদের চ্যানেলের টি আর পি বাড়িয়ে নেয়। এখানেও নারী ব্যবসায়ের মাধ্যম।

এরপর রইল চলচ্চিত্রের মতো জনপ্রিয় মাধ্যম। আগে, নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গ দৃশ্য থাকলে চলচ্চিত্রে (A) মার্কা থাকত, অথচ এখন যা খুশি তাই হচ্ছে। কলাকুশলীরা এখন চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে খোলামেলা দৃশ্যে অভিনয় করেছেন। অতীতের প্রখ্যাত চিত্রপরিচালকদের তো এইরকম দৃশ্য সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটেনি? তাঁরাও তো নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতার মতো বিষয়কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

আসলে এখন নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। যারা চালাচ্ছে বা চালিত হচ্ছে, সবাই অপরাধী। এরা নারীমুক্তির অর্থই বদলে দিয়েছে। বর্তমানে নারীমাত্রই পণ্য এবং যৌন- স্বেচ্ছাচারিতাই নারীমুক্তির শেষ কথা— এইভাবেই পরিবেশিত হচ্ছে নারী-স্বাধীনতা। বিভিন্ন মহিলা সংগঠন এবং নারীমুক্তির পক্ষে বক্তব্য রাখেন এমন বুদ্ধিজীবীরা ভেবে দেখেছেন কি— তাঁরা মহিলাদের কোথায় নিয়ে চলেছেন?

নারীমুক্তি মানে ভোগবাদ নয়। একটি মেয়েকে তার বাল্যকাল থেকে সুশিক্ষিত, সু-সংস্কারিত করে বড় করে তোলার দায়িত্ব তার অভিভাবকদের। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই সেই মেয়েটি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে তার জীবনে— এজন্য দামি কোম্পানির তৈরি পণ্যের বিশেষ কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। প্রয়োজন সু-শিক্ষা, সু-সংস্কারের। সুতরাং নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতাকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি যেভাবে পরিবেশন করছে তাতে প্রলুব্ধ না হয়ে, নিজের বোধবুদ্ধিতে পদক্ষেপ নেওয়াই ভারতীয় মহিলাদের কর্তব্য। ■

শ্যাওলা ঘৃণার বস্তু নয় একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বড় বড় ফুল ও ফলের গাছের থেকে একটু চোখ সরিয়ে ভেজা মাটি, দেওয়াল, কুয়ো বা কলপাড় এমনকী শামুকের খোলসের দিকে যদি একটু নজর দিই, তাহলে যে নানা রকম সবুজের আস্তরণ চোখে পড়বে তাকে আমরা এক কথায় শ্যাওলা বলেই জানি। শ্যাওলা বড় বিরক্তিকর জিনিস— পিছল পাড়, নষ্ট পুকুর, নর্দমার পচা গন্ধ, ভেড়ির আগাছা। এখন আবার এও শোনা যাচ্ছে যে তাজমহল বা ভিক্টোরিয়া শ্বেতপাথর নাকি এই শ্যাওলাই নষ্ট করছে। তাহলে শ্যাওলা শুধুই ক্ষতি করে? ফুল নেই, ফল নেই, মূল নেই, কাণ্ড নেই, এমনকী পাতাও পর্যন্ত নেই। তাকে গাছ কী করে বলা যায়? প্রসঙ্গত, গাছের মতনই শ্যাওলাও নিজের খাবার নিজের রান্নাঘরে সূর্যের রশ্মি এবং বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইজের সাহায্যে তৈরি করে নিতে পারে। রান্নাঘর হলো তার অংসখ্য সবুজ কণা (ক্লোরোফিল) আর খাবার হলো শর্করা জাতীয়। কিন্তু এই খাবারকে সে কোন রূপে নিজের ভাঁড়ারে রাখবে তা নির্ভর করে সে কোন প্রজাতির তার উপর। যাই হোক, শ্যাওলা যে এক ধরনের গাছ, সেটা না হয় মানা গেল, কিন্তু কীভাবে এই শ্যাওলা আমাদের উপকার করে সেটা আলোচনা করা যাক। ভাল হয় যদি দেখা যায়, পৃথিবী জুড়ে মানুষ শ্যাওলাকে কিভাবে কাজে লাগায়।

মানুষ নিজের সৃজনশীল ক্ষমতা দিয়ে শ্যাওলার নানাবিধ ব্যবহার আবিষ্কার করেছে। প্রথমেই বলা যায় খাদ্য হিসেবে শ্যাওলার ব্যবহার। শুনতে অবাক লাগলেও বলা হয় চীনে সত্তরটি প্রজাতির শ্যাওলা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জাপানে কুড়ি ধরনের শ্যাওলা প্রতিদিন রান্নার কাজে লাগে। চীন দেশের নববর্ষে একরকমের খাওয়ার প্রচলন আছে যা শ্যাওলা দিয়ে তৈরি। তার নাম— Nostoc-flaglliforme। স্পিরুলিমার নাম অনেকেই জানেন। এই ক্ষুদ্র শ্যাওলা বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা বাজারে খাবার হিসেবে তৈরি করে। এর খাদ্যগুণ তার উচ্চ প্রোটিন মানের জন্য অত্যন্ত বেশি। একইভাবে ক্লোরেলা নামে আরেকটি এককোষী শ্যাওলা প্রচুর প্রচার পাচ্ছে এবং বাণিজ্যিক স্তরে উৎপাদন হচ্ছে। তার নাম— Dunaliella salina। এই শ্যাওলাতে প্রচুর মাত্রায় বিট ক্যারোটিন ও ভিটামিন সি পাওয়া যায়। পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় আরও অনেক রকমের শ্যাওলা বাণিজ্যিক স্তরে চাষ হচ্ছে শুধুমাত্র খাদ্যের প্রয়োজনে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশ হলো— জাপান, আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, চিলি। আজকের বাজারে বেশ কিছু স্বাস্থ্যকর পানীয় পাওয়া যায় যা ডি. এইচ. এ সমৃদ্ধ। এটি স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ করে শিশু, প্রসূতি মায়ের জন্য বিশেষ উপকারী, যা শ্যাওলা থেকে তৈরি হয়। এছাড়া শ্যাওলাকে ওষুধ, প্রসাধনী সামগ্রীতেও ব্যবহার করা হয়। শ্যাওলা শুধুমাত্র মানুষের কাজে লাগে না, এটি জলজ খাদ্য শৃঙ্খলের প্রাথমিক উৎপাদক এবং এর উপরে নির্ভর করে বাঁচে জলের জীব। এছাড়াও মানুষ শ্যাওলাকে গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

চাষের সময় জমির শোধক, ধান জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও ময়লা জলের পরিশোধক হিসাবেও শ্যাওলাকে ব্যবহার করা হয়। বেশ কিছু শ্যাওলা আছে যা থেকে ক্যারোজিন, অ্যালাজিন, আগার দ্রব্য নিষ্কাশন করে তা দিয়ে আইসক্রিম, টুথপেস্ট, কেক, চকোলেট, চিজ এবং ক্রিম উৎপাদনের সময় ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে আবার স্যুপ, জেলি ইত্যাদি বানানোর সময় দেওয়া হয়। পুড়ে গেলে ক্ষতস্থানে আলাজিন ব্যবহার করা হয়। কাগজ ও বয়ন শিল্পে অ্যাজিন দিয়ে আগুন ও জল থেকে বাঁচানো যায় এমন কাগজ ও কাপড় তৈরি হয়। আগারের প্রয়োজন যে-কোনো জীবাণু বা জৈব পরীক্ষাগারে অপরিহার্য। এই তিনটি দ্রব্য সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে নির্গত হয়। এর পাশাপাশি শ্যাওলাকে জৈব জ্বালানি তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায়, যা একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। শ্যাওলাকে ঘিরে আমাদের অজানা জিনিস এত যে যদি আমরা সঠিকভাবে তাদের চিনতে পারি তবে বহু সমস্যার সমাধান এক নিমেষে হয়ে যাবে। সারা পৃথিবীতে কত প্রজাতির শ্যাওলা আছে তাই এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। প্রায় ৮০ শতাংশ শ্যাওলা আজও আমাদের কাছে অজানা, অচেনা।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

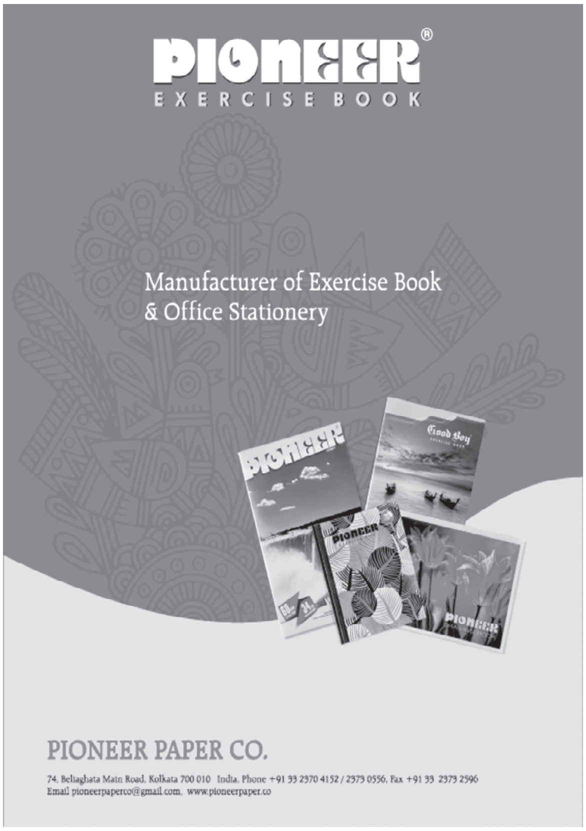

‘‘সনাতন ধর্মে যে মহান ঐশ্বর্য আমাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবনে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখে আমরা হিন্দুরা অকস্মাৎ সে বিষয়ে সচেতন হয়েছি। অতএব আমাদের এখন অপরূপ সরলভাবে হিন্দুধর্মের আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সেই আদর্শ কি, যদি প্রশ্ন করি, তবে বলা যায়— আমরা কি আমাদের সম্মুখে (এ বিষয়ে) দুটি দৃষ্টান্ত পাইনি যাঁদের জীবনে এই আদর্শ মূর্ত হয়েছে এবং যাঁদের পদচিহ্ন আমরা অনুসরণ করতে পারি? ’’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বীরভূমের কিশোরের আবিষ্কার

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জলের ট্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গরমকালে রোদে পোড়া ট্যাঙ্কের জলে স্নান করার সময় ছ্যাঁকা খাননি এমন মানুষ আমাদের দেশে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিশেষ করে যাঁরা একটু বেলায় স্নান করেন তাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। শীতকালে সমস্যাটা উল্টো। এ সময় যারা বেলায় স্নান করেন তাদের পোয়াবারো। যাদের কাকভোরে স্নান করে কাজে বেরোতে হয় অসুবিধে তাদের। গায়ে জল ঢালামাত্র জমে যাওয়ার উপক্রম হয়।

বীরভূমের মাড়গ্রাম হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্যামল দাস এই সময়ের ছেলে। এরা সমস্যার কথা ভেবে মাথা না খারাপ করে সমাধান খোঁজায় মন দেয়। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও যায়। শ্যামল যেমন এমন এক ট্যাঙ্ক তৈরি করেছে সেখানে জল গরমকালে থাকবে ঠাণ্ডা আর শীতকালে গরম। তার এই সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়ামাত্র ডাক এসেছে জাপান থেকে। শ্যামল সেখানে সাকুরা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশ নেবে।

শ্যামলের বাবা গোপীনাথ দাস পেশায় তাঁতশিল্পী। অভাবী পরিবার। দিনমজুরিতে তাঁত বুনে সংসার চালাতেই গোপীনাথবাবুর প্রাণ ওষ্ঠাগত। সংসারের অভাব মিটিয়ে ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাতে পারেন না। কিন্তু তাতে কিছু আটকায়নি। মেধাবী ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়েছে গোটা স্কুল।

অভিনব এই জলাধারের সৌজন্যে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় শ্যামলের ছাড়পত্র মিলতে পারে, এই আশায় গবেষণার যাবতীয় খরচের ভার নিয়েছেন শিক্ষকেরা। ট্যাঙ্ক তৈরির ভাবনার গোড়াপত্তন কয়েক বছর আগে। তখন শ্যামল সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সে নিজেই জানিয়েছে, এই ট্যাঙ্কে গরমকালে জল থাকবে ঠাণ্ডা আর শীতকালে গরম। কিন্তু কীভাবে সম্ভব হবে এই উলটপুরাণ? শ্যামলের নিজের কথায়, 'ট্যাঙ্কে থাকবে দুটি স্তর। দুই স্তরের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটি বালি দিয়ে ভরা। গরমকালে ট্যাঙ্কের ঢাকনা হবে কাঠের। জল ভরার সময় কিছু জল উপচে পড়বে মধ্যবর্তী বালির স্তরে। ফলে বাইরের তাপ ভিতরে যেতে পারবে না। শীতকালে পিভিসি পাইপের বদলে তামার পাইপ লাগাতে হবে। ঢাকনা হবে কাচের। এতে জল থাকবে গরম।'

শ্যামল দাসের তৈরি ট্যাঙ্ক (ইনসেটে শ্যামল দাস)।

জলাধারের মডেল গড়ে শ্যামল জেলা এবং রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু ওই একই মডেল দিল্লির সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে। এরপরেই দূতাবাসের মাধ্যমে বিষয়টি জাপান সরকারের নজরে আসে। ডাক আসতে দেরি হয়নি। ২৮ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রদর্শনী হবে জাপানে। সেখানে প্রদর্শিত হবে শ্যামলের তৈরি জলাধার।

সব মিলিয়ে খুশির হাওয়া মাড়গ্রাম হাইস্কুলে। প্রধান শিক্ষক সমীরণ মোস্তাফা বিশ্বাস বলেন, 'ছোট থেকেই শ্যামল মেধাবী। ওর বিজ্ঞানমনস্কতায় আমরা সবাই খুশি। আমরাই স্কুল থেকে ওর পাসপোর্ট করে দিয়েছি। সরকার যদি ওকে একটু সাহায্য করে তা হলে ও অনেক দূর যাবে।' ছেলেকে নিয়ে গর্বের ছোঁয়া বাবা গোপীনাথ দাসের চোখেও। তিনি বলেন, 'আমরা গরিব। মাটির বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী থাকি। ছেলের এই সাফল্যে আমরা গর্বিত। তবে মাস্টারমশাইদের সাহায্য না পেলে এসব হোত না।'

রাতের আশ্রয়

বৈশাখ মাস, বৃষ্টি বাদলের দিন শুরু। গ্রামের সুবল ফেরিওয়ালা কাপড় ফেরি করে বিক্রি করে। হঠাৎ করে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে বেচারার মহাবিপদ। মালপত্র সব জলে ভিজে যায়। আজ সকাল থেকে আকাশ মুখ ভার করে আছে। সুবল তবু সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো কাপড় ফেরি করতে।

আজ সে দূরের একটি অচেনা গ্রামে এসেছে। বিক্রিবাটাও বেশ ভালো হয়েছে। এদিকে কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে সুবল খেয়ালই করেনি। তাড়াতাড়ি করে সে বাড়ির রাস্তা ধরলো। আকাশে কালো মেঘ। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। একটু যেতেই অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এলো। গ্রামের রাস্তা শেষ হয়ে ফাঁকা মাঠের রাস্তা শুরু হয়েছে। রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা নেই। কিছুক্ষণ পর একফোঁটা-দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে বাতাসের বেগও বাড়তে লাগলো। মনে হচ্ছে কালবৈশাখী আসছে। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সুবল ভাবলো কোথাও আশ্রয় নেওয়া দরকার। নইলে যে তার সব কাপড় ভিজে যাবে! কিন্তু সে আশ্রয় পাবে কোথায়? অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আশেপাশে লোকবসতি আছে বলেও মনে হচ্ছে না। এদিকে বৃষ্টি ও বাতাসের বেগ আরোও বাড়তে শুরু করেছে। এমন সময় সামনের দিক থেকে কে যেন তাকে ডাকলো— দাদা এদিকে আসেন।

কে ডাকলো তা বোঝা যাচ্ছে না। সুবল অনুমান করে সেদিকে এগিয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকানির আবছা আলোতে মনে হলো সামনে একটা আটচালা। সুবল তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠলো সেখানে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে তো কিছুই দেখা

যাচ্ছে না। মনে হলো আরো দু-একজন আছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট এসে গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো— দাদার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

সুবল গ্রামের নাম করে উত্তর দিলো। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঘন ঘন মেঘের গর্জন। খানিকক্ষণ বাদে আবার একজন জিজ্ঞাসা করল— দাদা বোধহয় কাপড়ের ফেরি করেন, কাপড়গুলো ভিজে যায়নি তো? সুবল উত্তর দিল— না। এই ভাবে টুকটাক কথাবার্তা চলল। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। এদিকে রাত বাড়ছে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। বাড়ির জন্য চিন্তা হচ্ছে সুবলের। চালার একাকোণে একটি বাঁশের মাচা আছে। সুবল একসময় সেখানে বসে পড়লো। তারপর সারাদিনের ক্লান্তিতে দু-চোখ জুড়ে এলো ঘুম। ঘুম যখন ভাঙলো তখন ভোর। বৃষ্টি-বাদল সব কেটে গেছে। সুবল দেখল নদীর পাড়ে একটি গাছের তলায় সে বসে আছে। পাশেই সাইকেলটি রাখা আছে। গাছটির চারিদিকে পুরনো কাঁথা কম্বল, পোড়া কাঠ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ভেজা ছাইয়ের ঢিবি থেকে কেমন একটা কটু গন্ধ আসছে। ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো সুবল। একটু ধাতস্থ হয়ে গত রাতের কথা মনে করতে লাগলো।

গত রাতে তো সে একটি চালাঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে কয়েকজন লোকও ছিল। তাহলে সে এখানে এলো কী করে! লোকগুলো যদি চলেই গিয়ে ও থাকে তাহলে তাকে একবার জাগাবে না! অন্ধকার তখনো কাটেনি। সুবল মনে মনে ভয় পেল। আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি সে সাইকেল নিয়ে ছুটতে লাগলো। পুব আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। দূর থেকে তখন শোনা গেল হরিবোল বলোহরি হরিবোল। একদল শ্মশানযাত্রী মড়া নিয়ে শ্মশানের দিকে আসছে।

মালবিকা দে

ভারতের পথে পথে

তারাপীঠ

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহর থেকে একটু দূরে অবস্থিত দ্বারকা নদীর তীরে তারাপীঠ মন্দির ও মহাশ্মশান ক্ষেত্র। হিন্দুদের কাছে এই মন্দির ও মহাশ্মশান দুই-ই পবিত্র। সাধক বামাক্ষ্যাপা এখানে তন্ত্রসাধনা করেছেন। মন্দিরের অদূরেই তাঁর আশ্রম। কথিত আছে, মা তারা বামাক্ষ্যাপাকে এখানে দর্শন দিয়েছেন। এই স্থান দেবী মাহাত্ম্য ও সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধনক্ষেত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ঋষি বশিষ্ঠও এখানে সাধনা করেছেন বলে লোকমুখে প্রচলিত। তারাপীঠের মন্দির উত্তরমুখী। লাল ইটের তৈরি আটচালা মন্দির। মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনা চিত্রিত রয়েছে। এই তীর্থক্ষেত্র কিছুদিন আগেও সবুজের মাঝে এক গ্রামীণ তীর্থ ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রচুর জনসমাগমের কারণে তারাপীঠ ধীরে ধীরে একটি শহরের আকার ধারণ করছে। তারাপীঠে মা তারার পাশাপাশি ভগবান শিব এখানে চন্দ্রচূড় নামে পূজিত হন।

এসো সংস্কৃত শিখি

किं भो: दर्शनमेव नास्ति ?

আরে ভাই, আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না?

नैव, तत्रैव सञ्चरामि किल।

না, সেখানেই তো বেশি যাওয়া আসা করি।

किं, भो: वार्ता एव नास्ति ?

আরে, কোনো খবরই নেই?

किं भो: एकं पत्रम् अपि न लिखितम् ?

আরে ভাই, একটা চিঠি লিখলে না?

वयं सर्वे विस्मृतवन्त: किम् ?

আমরা কি সবাই ভুলে গেছি?

ভালো কথা

সংবাদ সংগ্রহ

প্রতিদিন টিভি ও খবরের কাগজে কত খবর দেখানো হয়, কত ঘটনার কথা, কত মানুষকে দেখানো হয়। সেই ঘটনাগুলি একদিন হারিয়েও যায়। তাই ভালো ভালো খবরগুলিকে সংগ্রহ করে রাখার জন্য আমি একটি সুন্দর কভার ফাইল তৈরি করেছি। তাতে ভালো ঘটনার সংবাদগুলি খবরের কাগজ থেকে কেটে আমি ফাইলে ঢুকিয়ে রাখি। এই কাজটি করছি প্রায় সাত মাস থেকে। ইতিমধ্যে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। প্রচুর খবরের মাঝে প্রকাশিত ভালো মানুষদের খবরের কথাও আমাদের ভুলে যেতে হয়। আমার এই কভার ফাইল সংবাদ সংগ্রহ তাদের কথা আমাকে বার বার মনে করিয়ে দেয়। আমাদের বাড়িতে আত্মীয়রা এলে আমি তাদেরকে আমার এই সংগ্রহ দেখিয়েছি। তারা খুব প্রশংসা করেছে। স্কুলের শিক্ষকরাও ভালো বলেছেন।

জয়দীপ সাহা, কলকাতা-৮

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) স কী য় দ

(২) চ লো না প

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) হাঁ বু স নো

(২) স বি র্জ ন

১০ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) বিরাগভাজন (২) অনিন্দ্যসুন্দর

১০ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) উপনিষদ (২) গণিতাচার্য

উত্তরদাতার নাম

(১) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, (২) অভিষেক শর্মা, খান্না, কলকাতা-৬
(৩) সুদেষ্ণা ঘোষ, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, (৪) প্রীতম মণ্ডল, সিউড়ি, বীরভূম

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শব্দরূপ-৮৩১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

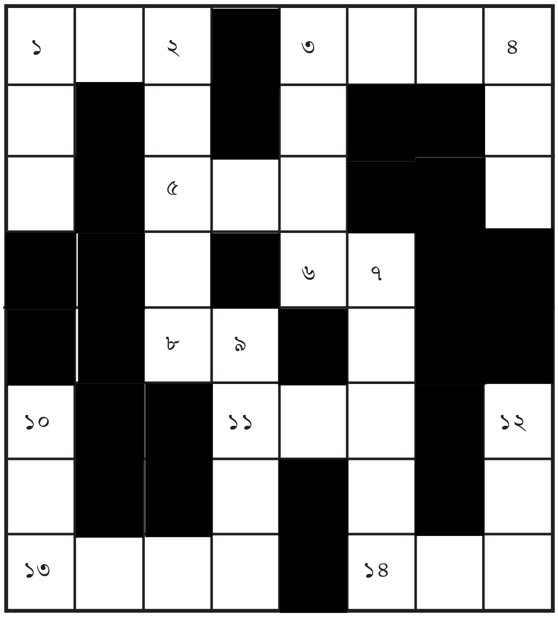

সূত্র :

পাশাপাশি : **১**. 'সত্যম্,—, সুন্দরম্', **৩**. ঋষিবিশেষ (পূর্বে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন), **৫**. স্রোত, অবিচ্ছেদ গতি, **৬**. ইঙ্গ প্রতিশব্দে কাগজের ২০ দিস্তা, **৮**. পর্বত, **১১**. রসবৃদ্ধিহেতু ভারাক্রান্ত, **১৩**. কোথাও আগুন লাগলে এরা ঘণ্টি বাজিয়ে ছুটে চলে, **১৪**. মজা, কৌতুক।

উপর-নীচ : **১**. শিবপত্নী, দুর্গা, **২**. মৃত্যু; মরণের উদ্দেশে যাত্রা, **৩**. মা মনসার একটি নাম, **৪**. তাঁতের মাকু, **৭**. বৌদ্ধ শ্রমণদের মধ্যে সর্বোচ্চস্তরের সাধক, **৯**. অমিল; হিসাব না মেলা, **১০**. দেবর্ষি বিশেষ (প্রবাদ — কলহের দেবতা), **১২**. লেজ।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২৮
সঠিক উত্তরদাতা
শিবরঞ্জন সাহা
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
সত্যম মাহাতো
হেতিয়াপাথর, বাঁকুড়া

ঈ			এ	গু	নী	মা	
শা			র		বা		
নী	হা	রি	কা		র	বা	ব
	ল					সু	
	খা					দে	
বা	তা	বি		বি	ভা	ব	সু
		জু		জ			প
	গৌ	রী	দা	ন			র্ণ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৮৩১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ মে ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৩০

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

অযোধ্যায় রামমন্দিরের পক্ষে মুসলমানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ শ্রীরামের জন্মস্থান অযোধ্যায় স্লোগান উঠল— ‘মুসলমান হক অউর ইমান কে সাথ আও, রামমন্দির নির্মাণ করাও’। তিন হাজার মুসলমান মহারাজগঞ্জ, বস্তি, লখনউ ও গোরক্ষপুর থেকে মাথার ইট নিয়ে অযোধ্যায় হাজির হন গত ২১ এপ্রিল। তাঁদের দাবি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের সবচেয়ে সহজ পথ হলো রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় পা না দিয়ে দেশের সব মুসলমানকে রামমন্দির নির্মাণে এগিয়ে আসতে হবে। এই দাবির সমর্থনে ফৈজাবাদ শহরে ১০টি বোর্ডিং লাগিয়েছে মুসলিম করসেবক মঞ্চ।

স্থানীয় হিন্দুদের বক্তব্য, ফৈজাবাদ ও অযোধ্যার মুসলমানরা রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে রয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন এবার শীঘ্র রামমন্দির নির্মাণের সব বাধা দূর হবে।

ডাকটিকিটে যানবাহনের ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যেদিন চাকা আবিষ্কার হয়েছে সেদিন থেকে শুরু করে ভারতের রাস্তায় যত রকমের যানবাহন চলেছে তার ধারাবাহিক ইতিহাস ডাকটিকিটের মাধ্যমে প্রকাশ করল

ডাকবিভাগ। সম্প্রতি যে কুড়িটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্থান পেয়েছে পালকি এবং পশুচালিত গাড়ি থেকে শুরু করে রিকশ, ভিন্টেজ কার, বাস, মেট্রো রেল— এমনকী ট্রামও। ‘ভারতের কালক্রমিক যানবাহন ব্যবস্থা’ শিরোনামাঙ্কিত ডাকটিকিটগুলি প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে হেরিটেজ ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়ামে। ডাকটিকিট প্রকাশ করেন হরিয়ানার গুরুগ্রাম ক্ষেত্রের পোস্টমাস্টার কল্পনা রাজশিঙ্ঘোট। উপস্থিত ছিলেন হেরিটেজ ট্রান্সপোর্টেশন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং ম্যানেজিং ট্রাস্টি তরুণ ঠাকরাল।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তরপ্রদেশ সরকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। এক সরকারি নির্দেশিকায় একথা জানিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে এই নির্দেশ কেউ অমান্য করলে তার ওপর এসমা (এসেনসিয়ান সারভিসেস মেইনটেন্যান্স অ্যাক্ট) আইন প্রয়োগ করা যাবে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি জিতেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হলো। ওই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ জনস্বার্থে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেসব কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করেন তারা যাতে ধর্মঘট না করতে পারেন তার জন্য এসমা প্রয়োগ করা হয়। এই আইনে কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

মধ্যপ্রদেশে অ্যান্টি-মজনু স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উ.ত্তরপ্রদেশের ধাঁচে মধ্যপ্রদেশ সরকারও রাজ্যের পুরুষসমাজের একাংশের ‘মজনু’-সদৃশ আচরণে রাশ টানতে উদ্যোগী হলো। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান বলেন, ‘সরকার এইসব মজনুর মানসিকতার বদল ঘটাতে চায়। এরা কাউকে সম্মান করে না। এরা সভ্যসমাজে থাকার উপযুক্ত নয়।

রাজ্যজুড়ে এদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হবে।’ তিনি আরও বলেন মহিলা এবং যুবতীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশকে আরও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সরকারি সূত্রের খবর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যান্টি মজনু স্কোয়াড গঠন করা হবে। এই প্রসঙ্গে সূত্রটি জানিয়েছে পুলিশ কোনোভাবেই নীতিপুলিশ হয়ে উঠবে না এবং বিবাহিত দম্পতি বা একসঙ্গে থাকা যুবক-যুবতীদের বিরক্ত করবে না।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
1 May - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।